দেখা

অনিরুদ্ধ বসু

দেখা

অনিরুদ্ধ বসু

দেখা

অনিরুদ্ধ বসু



স্মৃতি পাবলিশার্স

DEKHA

A Bengali Novel by ANIRUDDHA BOSE

Published by **SMRITI PUBLISHERS**

Website: www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ২০০৯

দ্বিতীয় প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০১০

দ্বিতীয় ই-বুক প্রকাশঃ আগস্ট ২০১৩

তৃতীয় প্রকাশঃ জুন ২০১৭

তৃতীয় ই-বুক প্রকাশঃ জুন ২০১৭

কপিরাইটঃ ©অনিরুদ্ধ বসু

প্রচ্ছদপটঃ পাপিয়া ঘোষাল

অলংকরণঃ স্বপন দত্ত

প্রকাশকঃ
স্মৃতি পাবলিশার্স
'ওয়েসিস'
সি এফ - ৪১
সেক্টার ১
সল্ট লেক সিটি
কলকাতা
৭০০০৬৪

ISBN No : 978-93-82303-88-6

আমার পরমশ্রদ্ধেয়া মা
স্বর্গত ইলা বসুকো

সূচি

যাদের সহযোগিতা এ লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়
পূর্ণশ্রী নাগ
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবাশিস গৌতম

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

অনিরুদ্ধ বসুর তৃতীয় উপন্যাস **"দেখা"**-র ভূমিকা লিখতে বসে কয়েকটা কথা মনে হল। মান আর হুঁশ ... এ দুই নিয়ে মানুষ। এ কথা অনেক শোনা। কিন্তু কি সত্যিই কখনো আমরা এ দুটো জিনিসের খোঁজ করি?

অনিরুদ্ধর এই ছোট উপন্যাসটি পড়ার পরে, অন্তত আমার একটা কথা মনে হচ্ছে যে, অনিরুদ্ধ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, এই লিরিক্যাল কাহিনিটিতে এই দুটি জিনিসেরই খোঁজ করে গেছে। মানুষের জীবনের অনেকগুলো মূল প্রশ্ন উঠে এসেছে এই উপন্যাসটিতে। পিতা কে? পিতৃস্নেহ কী এবং কেন? সন্তান স্নেহের আসল রূপটি কী? মা কাকে বলে? মাতৃত্ব কি অর্জন করা যায়? নাকি তা নিতান্তই এক জান্তব এবং জেনেটিক ব্যাপার মাত্র। জীবন আসলে কী এবং সবার উপরে এই জীবন নিয়ে কী করব?

এই বেসিক প্রশ্নগুলির উত্তর না খুঁজে পেলে আমাদের 'হুঁস' হবে না। আর হুঁস না হলে 'মান'-ও আসবে না।

অনিরুদ্ধ এক আপাত সরল কাহিনির মধ্যে দিয়ে চিন্তাশীল পাঠককে জীবন সম্পর্কিত অনেকগুলি মৌলিক প্রশ্নর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, এটাই এক সংবেদনশীল লেখক হিসেবে ওর কৃতিত্ব।

অনিরুদ্ধর এই উপন্যাসটির নাম **'দেখা'**। ছোট্ট নাম, কিন্তু তাৎপর্য গভীর। দেখা শব্দটির পেছনে তিনটি ফ্যাকটর আছে। দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং পর্যবেক্ষণ। কে দ্রষ্টা? যে দেখছে। এখানে কে দেখছে? শ্রাবস্তি, অরিজিৎ না মঞ্জরী? নাকি পাঠক? নাকি মহাকাল? দৃশ্যটাই বা কী? কী দেখছে ওরা? পশ্চিম দেখছে পুবের জাগতিক দৈন্যের পিছনের এক বিশাল বিরাট ঐতিহ্যকে। নাকি পুব দেখছে পশ্চিমের বৈভবের আড়ালের এক অনন্ত দৈন্যের হাহাকারকে? কী ভাবে দেখছে? অণুবীক্ষণে না দূরবীক্ষণে? নাকি বিহঙ্গদৃষ্টিতে?

এক আপাত সারল্যের আড়ালে, অনিরুদ্ধ এই জটিল প্রশ্নগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে। 'বুঝ জন যে জান সন্ধান' আর যদি সত্যিই মননশীল পাঠক এই প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজে পান, তবে সেটাই হবে তাঁর আসল দেখা... মান আর হুঁশকে দেখা। জীবনকে দেখা। জীবনের আসল **'দেখা'** কে দেখা।

আজ অনিরুদ্ধর এই তৃতীয় উপন্যাসটির ভূমিকা লিখতে বসে মনে হচ্ছে, খ্যাতিমান এই শল্যচিকিৎসক আরও আগে কলম ধরলে বোধহয় বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণালি ভাণ্ডার অনেক বেশি সমৃদ্ধ হত।

অলমিতি।
দুর্গাপুর জুন ২০

দ্বিতীয় প্রকাশের ভূমিকা

হয়ত অন্ধকারের পেছনেই দিয়া জ্বলে। ব্যথার নিভৃত আকাশে ফুটে ওঠে অরেকটা প্রেরণার অনুরণন। হয়ত বা ক্ষণস্থায়ী দুঃখকে বরণ করে নিতে হয় নতুন চেতনার আলোকে। যখন সৃষ্টি করাঘাত করে বিকিকিনির পৃথিবীতে। মনে হয় সব মিথ্যে। কেনই না লিখছি? কী হবে একান্ত মনের কথা নিবদ্ধ করে?

তাই দ্বিতীয় প্রকাশের ভূমিকা লিখতে বসে চোখে জল এসে গেছে। অনেক চোখের জল ফেলেছি প্রথম প্রকাশের পরে।

যে একদিন সাহিত্যকে বেছে নিয়েছিল তার নতুন চেতনার স্ফুলিঙ্গ হিসেবে, সে আজকে কেন লিখছে "কেনই বা লিখতে গেলাম?" সে কি অর্বাচীন কিছু প্রকাশকের ধৃষ্টতার স্বীকার হয়ে?

প্রথম প্রকাশ সাড়া জাগিয়েছিল বিদগ্ধ মহলে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরের চেতনায়। দুর্ভাগ্যবশত তা পৌঁছতে পারেনি জনসমক্ষে। কেন? অনেক প্রশ্নের উত্তর অপ্রকাশিতই থেকে যায়। তার কাহিনি কোনওদিন লিখব যদি বা ইচ্ছে হয়। এখন আমি নিঃশব্দ নাবিক। লিখে যাই আমার মনের ভাষা নীরবে অন্তহীন। উদাস মন, নিজেকে খোঁজে সর্বক্ষণ।

লিখি আমার মনের ছন্দে।

ভালো কী মন্দ ফুটবে আপনাদের পাওয়া না-পাওয়ার আনন্দে।

অনিরুদ্ধ বসু

কলকাতা
জানুয়ারি ২০১০

তৃতীয় প্রকাশের ভূমিকা

'দেখা' অনেক দিক দিয়েই আমার সাহিত্য জীবনের মাইলস্টোন।

এই উপন্যাসে রাবীন্দ্রিক ছোঁয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে, একবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে নতুন রূপে পদার্পণ। নতুন আঙ্গিকে, আজকের কথোপকথন ইংরেজি-বাংলা মেশানো রচনাশৈলী নিয়ে। হয়ত বাংলা ভাষার বিবর্তনে আগামীর দিশা। রবীন্দ্রোত্তর যে লেখা প্রকাশিত হয়েছে, সবই একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে। সরাসরি গল্প বলা। দেখার জাম্পকাট স্টাইল অন্যান্য সাহিত্যের থেকে ভিন্ন। বিদেশে থাকা, শ্রাবস্তির ইটোনিয়ান অ্যাক্সেন্ট দেশে কাটানোর পর কীভাবে বাংলা ভাষায় বিবর্তিত হল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যর প্রগতিতে ধ্রুবতারা।

প্রকাশনা জগতের অপকীর্তি, এই উপন্যাস, লেখালেখির সঙ্গে আমায় প্রকাশনার দুনিয়ায় আনে। প্রকাশকের গতের চিন্তাধারা ও খামখেয়ালিপানা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের প্রকাশনা স্মৃতি পাবলিশার্সের স্থাপন, বিন্যাস ও বিস্তার।

বারবার বেস্টসেলারই হয়নি, এখন পর্যন্ত আমার যত প্রকাশিত উপন্যাস, সর্বাধিক বিক্রিত ও আদৃত। বহুবার অনুমতি ছাড়া গল্পটিকে টুকতে গিয়ে বাংলা ছায়াচিত্র জগৎও বেকায়দায় পড়ে। রিলিজ আটকে অবশেষে আমার গল্প অনুকরণ বন্ধ করেছে। তাতেই প্রমাণ এই উপন্যাসের নিজস্বতা।

উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ উদ্বোধন হয়, মায়ের হাতে, আমার জন্মদিন ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯, গোর্কি সদনে। তাঁকে উৎসর্গ করা বলেই তাঁর আশীর্বাদ এই বইটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে। সব বাধা বিঘ্ন কাটাতে সহায়ক হয়েছে। এই উপন্যাসের হাত ধরেই আমার ইংরেজি সাহিত্যে পদার্পণ। দেখার ভাবানুবাদ The Vision দিয়ে ইংরেজি সাহিত্য যাত্রা শুরু।

আজকের যুগ-দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব কাহিনির মধ্যে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি শাশ্বত দ্বন্দ্ব ও সত্যকে। মানুষের চিরন্তন চাওয়া-পাওয়া, যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন। ফলে দু'প্রান্তে জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা, সমগ্র যাপনচিত্রটাই মানুষের মধ্যে বিশাল তফাত গড়ে দেয়। সেখানেও কোথাও-বা মিলনের আর্তিটুকু রয়ে যায়। যা অনেকটা সাগরের সঙ্গে আকাশের মিলনে ব্যবধানরেখার বিস্তারের সঙ্গে তুলনীয়। দৃশ্যমান অথচ অগম্য। নিঃসঙ্গতার ফাঁক পূরণ করাটা ইদানীং সর্বত্র বহুজনের কাছেই যথেষ্ট কষ্টকর। যে ধারণাটা ক্রমশ চারদিকেই প্রকট হয়ে উঠছে। কাহিনির বিস্তারে চরিত্রগুলোর অবস্থান, তাদের একাকিত্ব বা সংঘবদ্ধ বিচরণ ক্ষণস্থায়ী না কি চিরস্থায়ী সেই সিদ্ধান্ত পাঠকের। যুগের বিবর্তনে তা কতটা ছাপ রেখে যাবে, সময়ই বলে দেবে।

কালকের সাহিত্যকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য **স্মৃতি পাবলিশার্স** প্রকাশনাকে ধন্যবাদ। আর আমার স্ত্রী স্মৃতি বসুকে, যার ধৈর্য, সহায়তা ও উৎসাহ না থাকলে আমার চর্চা বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হত না।

মে ২০১৭
কলকাতা

অনিরুদ্ধ বসু

লেখকের বাংলা উপন্যাস



লেখকের ইংরেজি উপন্যাস



অনিরুদ্ধ বসু সম্বন্ধে কিছু কথা...



অনিরুদ্ধ বসুর জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫, কলকাতায়। পেশায় প্রখ্যাত প্লাস্টিক সার্জন। লেখাটা তার নেশা। ২০০৬ সাল থেকে উপন্যাস লিখতে শুরু করেন।

প্রথম উপন্যাস **'অন্বেষণ'** আলোড়ন সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্য মহলে। ছুঁয়ে যায় আপামর বাঙালি মন। তথাকথিত উচ্চবিত্ত সমাজের পঙ্কিলতা ঘেঁটে আসল ঘরের অমোঘ সত্যটা গণিতের Venn Diagram Theory-র ওপর ভিত্তি করে মানুষের সামনে তুলে ধরতে ধরতে সক্ষম হয়। পরে তার ইংরেজি ভাবান্তর 'Quest' নামক উপন্যাসে প্রকাশিত হয়।

তার দ্বিতীয় উপন্যাস **'নিঃশব্দে'** বর্তমান সমাজের বিরাট ক্যানভাসে আঁকা, আজকের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান খণ্ডিত সময়, পূর্ণতার আস্বাদ নিয়ে, এক সাধারণ মানুষের অসাধারণ জীবনদর্শনের উপাখ্যান। শুধু বহুদিন ধরে বেস্টসেলারই হয়নি, লন্ডন বুক ফেয়ারে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে বিশেষ সাক্ষর রাখে।

তৃতীয় লিরিক্যাল উপন্যাস **'দেখা'** তার পৃথিবী পরিক্রমা ও জীবন দর্শনের এক নিভৃত আরাধনা। পশ্চিম দেখছে পুবের জাগতিক দৈন্যের পিছনের এক বিশাল ঐতিহ্যকে। নাকি পুব দেখছে পশ্চিমের বৈভবের আড়ালে এক অনন্ত হাহাকারকে? কী ভাবে দেখছে? অণুবীক্ষণে না দূরবীক্ষণে? না কী, বিহঙ্গ দৃষ্টিতে! এই উপন্যাসও বেস্টসেলারের খাতায় নাম লেখায়। উপন্যাসটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় 'The Vision' নাম নিয়ে।

সে বারবার তার রচনাশৈলী ও চিন্তাধারাকে সাজাতে চায় নতুন আঙ্গিকে, নতুন দর্শনের বিন্যাসে।

যার ফলস্বরূপ তার চতুর্থ চাঞ্চল্যকর রহস্য উপন্যাস **'চক্র'** প্রচলিত দেশি ও বিদেশি প্রথার বেড়া ভেঙে পরিবর্তন এনেছে মৌলিক চিন্তাধারায়। যুক্তি বিদ্যা ও আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এক নতুন আঙ্গিকের রহস্য কাহিনি, যা খুন এবং খুনির বিবর্তন ঘটিয়েছে এই উপন্যাসটিতে। এটিও বেস্টসেলারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা পরে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে 'Fulcrum' নাম নিয়ে।

পঞ্চম উপন্যাস **'তোমাকে...'** - তে একটি গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে উপস্থাপনা করেছে প্রেমের ছন্দোময় পত্র-উপন্যাসে। নামহীন দুজন মানব মানবী, আধুনিক জীবনের গোলোকধাঁধায় কানামাছি খেলতে খেলতে কখন পৌঁছে যায় সময়ের অন্দরমহলে, যেখানে সময় হয়ে ওঠে উল্লম্ব, নিয়ে যায় তাদের তুরীয় লোকে। আগের

মতোই বেস্টসেলারের তালিকায় এটিও অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে প্রকাশিত হয় ইংরেজি উপন্যাস ‘The Moment’ নামে।

ষষ্ঠ বাংলা উপন্যাস **‘ক্যানভাসে’** মানব চরিত্রের রং-এর খেলা। প্রিজমের মধ্য দিয়ে চলা সাদা আলোর রঙিন বর্ণালীর মতো প্রতিটি মানুষের চরিত্রই নানা রং-এর। কখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একটি বিশেষ রং, আর কখনো বা ঝলসে ওঠে অন্য কোন রং, আসলে সবই তো সেই জীবন নামক প্রিজমের খেলা। একই জন, বিভিন্ন প্রকাশ। কেন্দ্রীয় চরিত্র নন্দিনী জীবনকে প্রীজম দিয়ে নানা রঙে ভেঙে অবশেষে পৌঁছে যায় রঙের ওপারে... এটিও বেস্টসেলারের তালিকায় নাম লেখায়। এটিও পরে ইংরেজিতে ‘Canvas’ নামে প্রকাশিত হয়ে পোস্ট মডার্ন সাহিত্য হিসেবে আলোড়ন তোলে সাহিত্য জগতে।

সপ্তম বাংলা উপন্যাস **‘স্ফুলিঙ্গ’** তে সর্বক্ষেত্রে বাঙালির পিছিয়ে পড়ার উন্নাসিক কূপমণ্ডুকত্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশানভূমি থেকে আলোর পাখি ফিনিক্সের উঠে আসার মতো উপন্যাসের প্রটাগনিস্টের লড়াই করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার গল্প।

তার প্রথম স্বরচিত ইংরেজি ইন্টারন্যাশনল অ্যাড্রিনালিন চার্জড থ্রিলার ‘Pursuit’ এক অনন্য চিন্তাশৈলীর উদাহরণ। অনেক রহস্যময় মৃত্যুর ফাঁকে উঠে আসে বর্তমান জগতের কঠিন জিও-ইকনমিক্স। আর নিভৃতে ফল্গুধারার মতো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউসিকের মতো বেজে চলে বিশ্বশান্তির অমৃতবাণী। উঠে আসে মানুষের উত্তরণের অমোঘ মন্ত্র, যা পরিণতি পায় তার আগামী ইংরেজি উপন্যাসে।

দ্বিতীয় স্বরচিত ইংরেজি অ্যাড্রিনালীন রেজার ‘Eternal Mayhem’ বিশ্ব জুড়ে বৈজ্ঞানিক খুনের প্রতিলিপি। বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক খুনের ব্যাপ্তি প্রসারিত বালি, পুনটা ক্যানা, হাওয়াই, ফিজি, থেকে জামাইকা, পিউয়ারটো রিকো ও ভারতে। সুন্দরী, সায়েন্টিস্ট, শিক্ষিত সম্প্রদায়, সবাই মারড়সার জালে জড়িয়ে পড়ে দ্রুতগতি এই ইন্টারন্যাশানাল থ্রিলারে। চলে যায় জেনেটিক ক্লোনিং রিসার্চের গভীর থেকে সভ্যতার বুৎপত্তিতে। উন্মোচিত হয় বহু অজানা সত্য মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্য।

পরের ইংরেজি থ্রিলার ‘Conumdrum’ এক অন্য ধাঁধা। অজ্ঞাত পরিচয় এক তুখড় বুদ্ধিসম্পন্ন খুনি অকল্পনীয় অঙ্কে একের পর এক খুন করে যাচ্ছে। সেই অঙ্ক খেলছে আরেক বুদ্ধিদৃপ্ত স্ট্যাটিসটিক্সের অধ্যাপকের সঙ্গে। খেলার গ্র্যামার না জানলে খুনের কিনারা করা অসম্ভব। অধ্যাপক কী ধরতে পারবে এই খেলার গণিত?

তার ইংরেজি উপন্যাস Shadow জীবনদর্শনের নতুন চিন্তাধারা। মানসিক উত্তরণ ও শান্তির চাবিকাঠি।

প্রতিটা লেখায় সে নিজেকে ভেঙে, নতুন ছাঁচে সাজাবার চেষ্টা করে। নিজেকে নতুন ভাবে প্রকাশ করার মধ্যেই তার সৃষ্টির তৃপ্তি। জীবনের শান্তি খুঁজে পায় স্ত্রী স্মৃতি বসুর মধ্যে।

দেখা

হয়ত কবির চোখ দিয়ে দেখলে ফুটে উঠত নতুন কোনও এক বকুল। কিন্তু মনের ধূসর ক্যানভাসে একটা প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে তো কবিতা লেখা যায় না। শুধু অতীত, ভবিষ্যৎ আর বর্তমান ভুলে, এক মুহূর্তের জন্য হলেও সোনালি রোদের ভেসে বেড়ানো মেঘের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলে ফেলা যায় "বিউটিফুল!"

তাই নিজের মনের গভীরের দীর্ঘশ্বাসকে এক মুহূর্তের জন্য চেপে সাদা রাজহাঁসের মতো সারি সারি ভেসে বেড়ানো মেঘের দিকে তাকিয়ে শ্রাবস্তি নিজের মনেই বলল "বিউটিফুল"। এই মুহূর্তের এইটুকু পাওয়া যেন ঘন কুয়াশার মধ্যে বেঁচে থাকার একটুকরো স্ফুলিঙ্গ। তার মধ্যেই আছে সারা বিশ্বের আনন্দ।

মাটি থেকে ৩৬০০০ ফিট ওপরে ৩৬০ মাইল বেগে ছুটে যাওয়া ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কলকাতা-হিথরো ফ্লাইটের জানলার পাশে বসে এ ছাড়া শ্রাবস্তির আর কী-ই বা করার থাকতে পারে?

রাজহাঁসের মত মাথা তুলে বোয়িং ৭৮৭ মহাকাশ বিদীর্ণ করে ছুটে চলেছে, একটা আধা-চেনা নিজের মাটির গন্ধ ছেড়ে এক ফেলে আসা স্বপ্নের পৃথিবীর মায়ালোকে।

কোনটা মায়া?

আর কোনটা তার ছায়া?

শ্রাবস্তির মনে হল, ছায়া মায়ার আলো-আবছায়াতে, এই মুহূর্তের সুন্দর সোনালি আলোর আভা, যা নীচে ভেসে থাকা মেঘের সারির বুকে ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে, সেটাই কায়া। তার নিজের আমির আবছায়ার ওপর, যাদুকরের মতো, তার ম্যাজিক ওয়ান্ড বুলিয়ে দিচ্ছে...

এবার বোধহয় জাগবার সময় হয়েছে।

সাদা ধবধবে মেঘগুলো কেমন হেসে হেসে নির্দ্বিধায় ভেসে বেড়াচ্ছে। যতক্ষণ না সূর্য মুখ লুকোবে পুঞ্জীভূত মেঘের গাঢ় অন্ধকারে। ততক্ষণ পর্যন্ত এরা ভেসে ভেসে, হেসে হেসে চলে যাবে অনন্ত অসীম মহাশূন্যে। দূর থেকে দূরান্তে। বাধাহীন, বন্ধনহীন, নীল আকাশে ওড়া পাখিটার মতো। এর মধ্যেই তারা খুঁজে নেবে তাদের নতুন দিগন্ত। কিংবা অন্তের সংকীর্ণতা থেকে বিপুলের অসীমতার অনন্ত।

"ম্যাডাম হোয়াট উড ইউ প্রেফার? টি ওর কফি?"

"কফি প্লিজ, উদাউট এনি সুগার ওর মিল্ক"

কফিতে চুমুক দিল শ্রাবস্তি। মনে পড়ে গেল, গতকাল পর্যন্ত ভোরবেলায় সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা অরিজিৎ বসু কফির কাপটা বেডসাইড টেবলে রেখে ঘরের পর্দা টানতে-টানতে একগাল হেসে বলত "মর্নিং ম্যাম। এবার ওঠার সময় হয়েছে"

কেন যে নিজেই কফিটা নিয়ে আসত, বোঝেনি শ্রাবস্তি। বাড়িতে তো কাজের লোকের কোনও অভাব ছিল না। তবুও... শুধু কী ওয়েস্টার্ন কালচারে বড় হয়ে ওঠা শ্রাবস্তিকে, ইস্টার্ন আপ্যায়নের ছোঁয়া দেখাতে? না কি, মনের ভেতরের একরাশ পুঞ্জীভূত আবেগকে একটা নির্বাক ব্যাখ্যা দিতে?

নীচের মেঘটা কেটে গেছে। এখন রাতে পূর্ণিমা দেখা যায়। ভোর রাতে রিপোর্টিং টাইমে, পূর্ণিমার চাঁদ মিলিয়ে যাওয়ার আগে, পূর্বের সূর্যের রশ্মির লাল আভা ভরিয়ে দিয়েছিল দমদম বিমান বন্দর। সকালের রক্তিম আভা যেন হোলি খেলে যাচ্ছে ভোরের আজানের সুরে ভরা নীচে ভেসে বেড়ানো মেঘটার ফাঁকে। কিংবা তার মনের এক অদেখা আকাশে। শূন্যতা থেকে পূর্ণতার এক নতুন দিগন্তে। হারানো থেকে পাওয়ার এক নতুন মর্মে। নতুন মর্ম, যা তার হারিয়ে যাওয়া সত্তাটাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

স্টিভস থটস ডোন্ট মেক হার মেলাঙ্কলাস। স্পেন্ডিং এ মুনলিট ইভিনিং অ্যাট দ্য ফ্রেঞ্চ রিভেরা, ডোন্ট মেক হার হার্ট বিট উইথ অ্যান এক্সট্রা রিদিম। মোর সো, ইট ইজ দ্য ক্লাউডস, দ্যাট ফ্রিস হার ফ্রম দ্য চেনস অফ দ্য ফাইনাইট, টু ফ্যাদম দ্য আনলিমিটেড বাউন্ডারিস অফ দ্য ইনফাইনাইট। সো সুইট ওয়াজ নেভার সো ফেটাল। আই মাস্ট উইপ। বাট দে আর ক্রুয়েল টিয়ার্স, দ্য সরোস হেভেনলি।

****

নীল জিনস, সাদা টপস পরা শ্রাবস্তির প্রসাধনহীন মুখে যেন একটা অচেনার উদ্বেগ। এই অচেনাই তাকে বারবার হাতছানি দিয়েছে।

একবার...

বারবার...

হাজারবার।

তার পঁচিশ ছোঁয়া চেহারাটার মধ্যে ভারতীয় রং-এর বহিঃপ্রকাশ হলেও, কোথাও ব্রিটিশ ইটোনিয়ান অ্যাক্সেন্টটা বুঝিয়ে দেয়, দেহের সঙ্গে উচ্চারণের বিপুল পার্থক্য। যেন দু-দেশের টাগ-অফ-ওয়ার চলেছে। কে জেতে? একেবারে নারকেল যে। বাইরেটাই যা কালো। ভেতরটা সাহেবদের থেকেও পরিচ্ছন্ন ধবধবে।

সমুদ্রের পাড়ে বালির ওপর লাউঞ্জারে শুয়ে দিনশেষের বিদায় নেওয়া সূর্যটার দিকে চেয়েছিল শ্রাবস্তি। সমুদ্রের জল পা ছুঁয়ে যাচ্ছে। চটিটা গাড়িতে ফেলে খালি পায়ে বসে উপভোগ করতে করতেই হারিয়ে গেছিল শ্রাবস্তি।

অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিয়েছিল দূর প্রান্তরে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পৃথিবীর সঙ্গে তার আলো-আঁধারি লুকোচুরি। বিদায় নেওয়ার আগে দিনান্তের শেষ রাগিনী শুনিয়েছিল শ্রাবস্তি বসুকে। ঝাউবনের ও-প্রান্তে, অবিরাম ঝিঁঝি পোকার ডাক অর্কেস্ট্রায় এক নতুন সিম্ফনি বাজিয়ে জানান দিয়ে গিয়েছিল - সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই।

পশ্চিমবাংলার সমুদ্র সৈকতটা ওদেশের থেকে অনেক আলাদা। এখানে করফু, মাজোরকা বা ইবিজার মতো উন্মাদনা নেই। এখানে আছে, নিঃশব্দ এক নিঝুমতা। এখানে আছে, নিজের জন্য কয়েক মুহূর্ত। এখানে আছে, সমুদ্রপাড়ে বসে অরিজিৎ বসুর কথা শোনা।

নতুন করে খুঁজে নেওয়া অনেক দিনের ফেলে আসা জীবনের গান। অনেক প্রশ্ন। অনেক কৌতূহল। সব যেন শেষমেশ গিয়ে মিশেছে মোহনায়... হারিয়ে যাওয়া পুরনো স্মৃতি আঁকড়ে, কিছু মুহূর্ত ভাগাভাগি করে নেওয়া ।

বাবার দিকে তাকিয়ে শ্রাবস্তি বলেছিল “বিউটিফুল!”

অরিজিৎ বসু কিন্তু অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে ছিল না। ভারী চশমার ফাঁক দিয়ে দেখছিল তার বহুদিনের হারানো মেয়ে শ্রাবস্তিকে। যেন বহুদিন আগের নিজেকে দেখা।

অনেকদিন আগে লন্ডনের নরউড গ্রিনের ফ্ল্যাটে সে ওকে জীবনের প্রথম পদক্ষেপ নিতে শিখিয়েছে। মন বলছিল, শেষ বেলায় কী সেই মেয়ে তাকে হাত ধরে অন্তিম পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যাবে? জীবনের সব চাওয়াকে মুছে, এইটুকু পাওয়ার অপেক্ষায় কী দিন গোনা?

মেয়েকে বলেছিল “চা খাবে?”

“ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য হোটেল, ড্যাড” শ্রাবস্তি বাবার দিকে ঘুরে প্রশ্ন করছিল।

“কেন যেতে হবে? ওই ঝুপড়িতেই চা পাওয়া যায়”

“আর ইউ সিওর, আই ওন্ট গেট এ টামি আপসেট?”

“একেবারেই নয়। ভাঁড়ে চা। তাও আবার বয়েল্ড। ইউ কান্ট গেট এ মোর স্টেরাইল অ্যাটমসফিয়ার” ড্রাইভারের দিকে ইঙ্গিত করে চা আনতে বলেছিল।

অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে শ্রাবস্তির মনে হয়েছিল, ছোটবেলায় শোনা দ্য সান নেভার সেটস ইন ব্রিটেন, কেমন ধোঁয়াশা ভরা। অর্থহীন।

এমন সূর্যাস্ত তো আগে দেখেনি। সারাদিনের ফ্যাচফ্যাচে বৃষ্টির মধ্যে সূর্যর দেখা পাওয়াই ভার। সূর্যাস্ত তো দূরের কথা। পাউন্ড খসিয়ে ইবিজা, ম্যলোর্কা, বা সিসিলিতে গিয়ে প্রকৃতিকে খুঁজতে হয়। আর এখানে তিন-ঘণ্টা ড্রাইভ করলেই বিউটিফুল সি-বিচ উইথ অ্যাম্পেল গ্রিনারি।

এখানে উন্মাদনা নেই নাইট লাইফ নেই ডিস্কো নেই

আছে একটা শান্ত নিরবচ্ছিন্ন মাদকতা।

উজোর নেশায় ভারী বাজনার তালে তালে ভোর রাত পর্যন্ত উন্মাদ নৃত্যের মধ্যে ডুবে ক্লান্ত অবসন্ন নেশাগ্রস্ত দেহটাকে খাটের মধ্যে ছড়িয়ে হারিয়ে যাওয়ার থেকে, এই শান্ত নির্জন পরিবেশে আরেকবার একাকী, নিজেকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখা।

অরিজিৎ জিজ্ঞেস করল "কিছু খাবে?"

"নো ড্যাড.... নট দ্যাট হাঙ্গরি"

বাবার থেকে চোখ ঘুরিয়ে আবার তাকিয়েছিল দিন শেষের ক্লান্ত শান্ত সমুদ্রে। সূর্যের শেষ-রশ্মির আভাটা আছড়ে পড়েছে। সেই আভায় মুক্তোর মতো চিকচিক করছে জল। মৃদুমন্দ ঢেউগুলো প্রতি মুহূর্তে সেই ঝিলিকের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। পেছনে ঝাউগাছের সারির ফাঁকে আলোর আবির ছড়িয়ে বাবার মুখে।

বাবা চিরকালই ফরসা। বাঙালি বলে চেনাই যায় না। মনে হয়, কোনও আরব দেশের বাসিন্দা। ৫' ৮" লম্বা। ছিপছিপে গড়নের মধ্যভাগে একটু মেদ। সৌম্য চেহারা। সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবিতে যেন অ্যারেবিয়ান নাইটস-এর শেখ। পাঠান বলেও ভুল হতে পারে। ডান হাতের রোলেক্স ঘড়িটায় আভিজাত্যের প্রকাশ।

"ড্যাড, দ্য সানসেট হিয়ার হ্যাস এ সিরিনিটি, এ ট্র্যাঙ্কুইলিটি, হুইচ ইজ সো ভেরি মিসিং ইন আওয়ার পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড"

অরিজিৎ হেসে বলেছিল "দ্য সানসেট ইজ দ্য সেম এভরিহোয়ার। হোয়াট ইজ মিসিং ইজ দ্য ওয়ে অফ লুকিং"

শ্রাবস্তি জবাব দেয়নি। সিসিলি, নিসে বা ইবিজাতে অনেক উন্মাদনা। তাই সময় নেই প্রকৃতিকে অনুভব করার। সেখানে প্রকৃতি একটা অবগুণ্ঠন। যার ছত্রছায়ায় সেই ইংরেজি ফিস অ্যান্ড চিপস উইথ মাসড পিস-টাই বেশি আকর্ষণীয়।

সেদিন যখন ফোনে শ্রাবস্তি বলল "ড্যাড আই ওয়ান্ট টু মিট ইউ" বিশ্বাস করতে পারেনি অরিজিৎ। ঠিক শুনেছে তো? বয়স হয়ে গেছে। কানের কী কোনও ভরসা আছে?

"শ্রাবস্তি ফ্রম ইংল্যান্ড?"

"ইয়েস ড্যাড" ওপাস থেকে ভেসে এসেছিল শ্রাবস্তির ইটোনিয়ান অ্যাকসেন্ট।

কতদিন মেয়েকে দেখেনি। চিনতে পারবে তো? কাবুলিওয়ালার মতো শ্রাবস্তির ছোটবেলার ছবিটা বুকে আঁকড়ে ধরে এত বছর পার করে দিয়েছে। সেই ছোট্ট শ্রাবস্তি পঁচিশে পা দিয়েছে। ওর জন্মের শুভক্ষণের কথা মনে হতেই শিউরে উঠেছিল অরিজিৎ বসু।

প্রতিবছর শ্রাবস্তির জন্মদিনে ওর মঙ্গল কামনায় কালীবাড়িতে পুজো দেয়। স্বপ্নেও একবার ভাবেনি শ্রাবস্তি কী রকম দেখতে হয়েছে। ভাবলেই কষ্ট। ভাবলেই দুঃখ। শুধু মূর্তিপুজোয় নির্বাক আশীর্বাদ জানায় হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে।

সেই মেয়ে আজ তার পাশের লাউঞ্জারে বসে মন্দারমণিপুরের সূর্যাস্ত উপভোগ করছে। ভাবতে না পারলেও, এটাই সত্যি। এই সত্যটাই তো জীবন। বাস্তবের সামনে মুখোমুখি। তাকে অনুভব করতে ফিরে গেছে অতীতে...

শ্রাবস্তি অরিজিতের দিকে তাকিয়ে বলল "টুডে ইজ পূর্ণিমা, ইজন্ট ইট?"

পূর্ণিমা মানে বিথোভেনের মুনলিট সোনাটা। বিথোভেনের সোনাটার বাইরেও তো কোনও সুর থাকতে পারে। সেটা খুঁজতেই এখানে আসা। নতুন করে, রক্তের বন্ধনকে নতুন রূপে চেনা। নতুন ছন্দে, নতুন প্রাণের জোয়ারে। আবার নতুন করে, নতুন আবেগে, নতুন পথ চাওয়া।

"হ্যাঁ আজ পূর্ণিমা" অরিজিৎ ফিরেছিল।

কিছুক্ষণ পরেই বাইরের পূর্ণিমা ভরে দিয়েছিল অন্ধকার সমুদ্রসৈকত। কিন্তু অরিজিতের জীবনের পূর্ণিমা, শ্রাবস্তির ফোন পাওয়ার পর থেকেই মিটমিট করে হাসতে শুরু করে দিয়েছে। জ্যোৎস্নায় ভরিয়ে দিয়েছে তার আবছায়া অন্ধকারে ভেসে বেড়ানো হৃদয়ের সিল্যুট।

***

হোয়েন স্টিভ ওয়াকড আউট অফ হার উইথ লিন্ডা, শ্রাবস্তি হ্যাড লস্ট হার ওয়ার্ডস। অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট, ইন দ্য টোয়াইলাইট অফ হার মেলাঙ্কলি সি ক্যুড হিয়ার এ ভয়েস, এ ভয়েস ফ্রম উইদিন 'দ্য এন্ড মার্কস দ্য বিগিনিং ওফ এ নিউ এরা'

আর সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হয়েছিল আরেক অনুরণন। বিচ্ছেদের মধ্যে জীবনকে পাওয়ার নতুন চেতন।

রঞ্জিতা বলেছিল "নেভার মাইন্ড। ইট হ্যাপেনস ইন অল অফ আওয়ার লাইভস"

শ্রাবস্তির মনে হয়ছিল, যদি হওয়ার-ই থাকে নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনও কারণ আছে। সেই কারণটা খুঁজতে হবে। বারবার একই গোলকধাঁধার খেলায় ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন কী?

রঞ্জিতা ঠিক বলছে না। মাকে সে ছোটবেলা থেকেই দেখছে। জীবনের সব চাওয়াকে দৈনন্দিন হিসেবের চোরাবালিতে ফেলে স্বর্গ খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্বর্গ যেন মেটিরিয়ালিজম-এর চৌহদ্দির মধ্যে বন্দি। সেই স্বর্গটার জন্যই তো মায়ের হাত ধরে আজ সে বিলেতে সব কিছু পেয়েছে। বাবা তাকে কিছুই দেয়নি, খালি বুদ্ধিটুকু ছাড়া।

স্টিভের কাছে ধাক্কা এক নতুন অনুরণন। তার না-দেখা নিজের অস্তিত্বের আরেক অবগুণ্ঠন। দ্যাট শ্রাউড হ্যাস টু বি রিভিল্ড। তাহলে কী মায়ের দেখানো পৃথিবীর মধ্যে কোথাও খামতি ছিল? আগেই সন্দেহ ছিল। এখন নিঃসন্দেহ হল। মা ঠিক নয়। যদি ঠিক হত, স্টিভ তাকে ছেড়ে চলে যেত না। তার নিজস্ব পূর্ণতার মধ্যে কোথাও যেন একটা শূন্যতা। শ্রাবস্তি তো আর ভারতবর্ষ দেখেনি। কী করে জানবে সে ওয়েস্টার্ন পৃথিবীর বাইরের কথা?

তাই এবার মায়ের কথার তালে, ছন্দ না মিলিয়ে জীবনের ঝংকারে তাকে খুঁজে পেতে হবে। এবার সময় হয়েছে জানা থেকে অজানায় পাড়ি দেওয়ার... নিজেকে চেনার... নিজের রক্তটাকে খুঁজে নেওয়ার...

ছোট্ট সিন্দুকে লুকিয়ে থাকা চিরকুটটা বার করে দেখেছিল নম্বরটা। বাবার হাতে লেখা। শেষ বিদায়ের উপহার।

"ইফ ইউ নিড মি জাস্ট কল মি" বাবা চিরকুটটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল।

চেহারাটাও একটা আবছায়া অস্তিত্ব। মানুষটার কথা এতদিন পরে কতটুকুই বা মনে আছে? একটা নাম। একটা পদবি। এক অপরিচিত মানুষের অস্তিত্ব, সে আজও পরম্পরার মতো বহন করে চলেছে। তার মূল্য কী ব্রিটিশ বার্থ রেজিস্ট্রারেই শেষ হয়ে গেছে?

ইন্টারনেট ঘেঁটে বাবার হদিস মিলিয়ে নিয়েছিল। নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর। তখন রাত ক'টা জানে না। ইন্ডিয়াতে বোধহয় সকাল। ফোনটা তুলে বলেছিল "ড্যাড আই ওয়ান্ট টু মিট ইউ"।

একটা পঙক্তি। অনেক না-বলা কথা বলে দেয়।

একটা উক্তি। অনেক সুপ্ত চেতনাকে, জাগিয়ে দেয়।

একটা সুদূর... বিপুলতায় হারিয়ে যাওয়া আবছায়া অবয়বের মধ্যে হাতছানি দিয়ে কাছে টেনে নেয়।

শুরু হয়ে গিয়েছিল মনের ভেতরে, জানা থেকে অজানার পথে ছোটার অশ্বমেধ। ঘোড়া ছুটবে। যেদিকে ছুটবে, সেদিকেই যেতে হবে।

মা তো অশ্বমেধ যজ্ঞে বিশ্বাস করে না। অতীত কলকাতার কোন এক বাই-লেনে ফেলে এসেছে। ডার্টি পলিউটেড কলকাতার লেক গার্ডেন্স, রেল লাইনের ধারে গলির চায়ের দোকানে প্রাণের স্পন্দন নেই। প্রাণের ঝংকার আছে হ্যারডস-এর সেলে। টটেনহাম কোর্ট রোডের বুটিকে। বিদেশি ধাঁচে নিজেকে ময়ূরপুচ্ছধারী কাক সাজিয়ে ফেলায়।

মা বিশ্বাস করে শুধু জাগতিক সুখে। যা দেখা যায়, তাই সত্য। যা বোঝা যায়, তাই ভবিতব্য - এমনটাই।

এই সময়ের মধ্যে যা কিছু করে নেওয়া যায়, সেটাই জীবন। যেটুকু পাওয়া যায়, সেটাকে পঞ্চেন্দ্রিয়র মধ্যে সীমিত রাখাই ভালো। এর বাইরের পৃথিবীকে জেনেই বা কী লাভ?

সেই বন্ধন ছেড়ে বেরতে এবার মন ডুকরে কাঁদছে।

সব দেখেও, কিছুই দেখা হল না।

সব জেনেও, শেষ পর্যন্ত কিছুই বোঝা হল না।

সব পেয়েও, কিছুই পাওয়া হল না।

তাই মায়ের অজান্তে, গভীর রাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে শুরু হয়ে গেল, শ্রাবস্তির ঘোড়া ছোটানোর পালা।

***

মা কোনওদিন বুঝবে না। যার চাওয়া-পাওয়া ভোগের আড়ম্বরে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় স্বামী ডেভিডের ক্যান্টারবেরির প্রাসাদের অঢেল সবুজের মধ্যে, হিটেড সুইমিং পুল থেকে বাইরের শীতের সূর্যটাকে উপভোগ না করে, লাউঞ্জারে শুয়ে, বারবার হিসেব মেলাবার চেষ্টা করেছে। মার্সিডিজ কনভার্টিবল নিয়ে ছুটে গেছে শপিং সেন্টারে। ফিরে এসেছে গাদা-গুচ্ছের জামাকাপড়, পার্ল নেকলেস থেকে, রয়েল ডল্টন-এর চৌত্রিশতম ডিনার সেট নিয়ে। লেক গার্ডন্সের এঁদো গলিতে বসে, ভাবতেও কী পারত, সে একদিন এই বিশাল প্রাসাদে রাজত্ব করবে?

স্বপ্ন না দেখলে কিছু হয় না। তাই স্বপ্ন দেখাই ভালো। সেই স্বপ্নের হাত ধরেই বিদেশে পাড়ি...

তারপর?

যখন লাগুভেলিনের শেষ পেগে গলা ভিজিয়ে পুলিশ চোখের আড়ালে ডেভিড বাড়ি ফিরেছে, মা তখন লারপোস খেয়ে, গভীর ঘুমে মগ্ন।

ঘুমের মধ্যেই শান্তি। তৃপ্তি। স্বপ্নের মাদকতা।

ডেভিড কিন্তু মায়ের ঘরের দিকে যাওয়ার চেষ্টাও করেনি। ক্যান্টারবেরির ম্যানসনে কী ঘরের অভাব? কোনও একটা ঘরে টাই না খুলেই জুতো পরা অবস্থায় নিজের অসাড় দেহটা এলিয়ে দিয়েছে।

তারপর?

আর মনে নেই।

পরের দিন সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট তৈরির সময় ভেবেছে - আজ যদি সুজি থাকত? তাহলে বেকন অ্যান্ড এগস-টা নিজে করতে হত না।

রঞ্জিতা টোস্টের ওপর স্ক্র্যাম্বেল্ড এগস-টা পেতে বলেছে "আই মাইট বি লেট টুনাইট"

ডেভিড চুপ করে থেকেছে। প্রশ্ন করলে, রঞ্জিতার মুখের ঝামটা খেতে হবে। খোদ ব্রিটিশ সাহেব তো। খুব ভালো করেই জানে, কখন সরে পড়তে হবে।

ব্রেকফাস্ট টেবলে শ্রাবস্তি নেই। নিস্পৃহ দাম্পত্য জীবনের অর্থহীন বচসার মধ্যে তার কোনও জায়গা নেই। মা ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলে 'বাবা' প্রপার্টির তদারকিতে বেরিয়ে যাওয়ার পর, শ্রাবস্তি নিজের ব্রেকফাস্ট নিজেই তৈরি করে নিতে পারবে।

"ক্যান উই টক?" স্টিভ কিছু বলতে চাইছিল।

"হোয়াট ইজ দেয়ার টু টক? ইটজ ওভার। ইউ ওয়ান্টেড ইট দ্যাট ওয়ে"

"স্টিল উই কুড বি ফ্রেন্ডস?"

"বেটার নট। হোয়াটজ দ্য পয়েন্ট ইন টেকিং এ রিলেশনশিপ ফরোয়ার্ড, হুইচ হ্যাস অলরেডি এন্ডেড?"

না চাইতেও এন্ড যখন তার ছোট্ট স্বপ্নমাখা জীবনকে এলোমেলো করে দিয়েছে, তখন ধোঁয়াশায় ভরা শেষটাকে আরও ধোঁয়াশায় টেনে নিয়ে লাভ কী? তাছাড়া পুরোনো একটা অস্তিত্বহীন সম্পর্কের চোরাবালিতে জড়িয়ে, নিজের কনফিউশনটাকে আর বাড়াতে চায় না। মনে মনে শেষটাকে পেছনের অন্ধকারে ফেলে, নতুন সানরাইজকে বরণ করে নিয়েছে শ্রাবস্তি। স্টিভ এখন অতীত। ইউসিএইচ-এর দিনগুলো এখন একটা ধোঁয়াশায় ভরা অতীতের স্মৃতি।

সে শুধু ক্যান্টারবেরিতে এসেছিল একটু স্পেসের জন্য। এ স্পেস হুইচ সি সো ডেস্পারেটলি ওয়ান্টস অল এলোন।

ডেভিড অর মাম-এর সঙ্গে নয় ।

***

অরিজিৎ খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল “এখন তো বসন্ত নয়”

মঞ্জরী আকাশে উড়ে যাওয়া এক ঝাঁক সাদা পায়রার দিকে তাকিয়ে বলল “ওকথা বলছ কেন?”

“শুনতে পাচ্ছ না কোকিলের ডাক?”

মঞ্জরী কান পাতল বনবিতানের গাছের ফাঁকে। নিস্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। পড়ন্ত সূর্যের রক্তিম আলোয় স্নান করে শুনতে চাইল কোকিলের গান। অরিজিতের হাতে হাত রেখে, মিষ্টি হেসে বলল “তুমি ঠিকই বলেছ। বসন্ত আসতে আর বেশি দেরি নেই”

অরিজিৎ মঞ্জরীর চোখের ওপর চোখটা নামিয়ে আনল। ওর কাজলকালো চোখে কী সে বনলতা সেনকে খুঁজছে? না কি, মঞ্জরীকে বিশ্বাস করতে চাইছে? চাইছে, অথচ পারছে না। অরিজিতের কাছে শীতের মিঠে আমেজটা অনেক বেশি আরামদায়ক। বসন্তের স্বপ্ন নিয়ে পড়ে থাকতে চায় না। স্বপ্ন বড় বেদনাদায়ক। আশা-ই হতাশার কারণ। আশার চোরাবালিতে, হতাশার মরুভূমি গড়তে চায় না।

মঞ্জরীরকে বলল “কী আসবে, অতশত ভাবি না। শীতটা গা সওয়া হয়ে গেছে। বেশ লাগছে” নিজের প্রৌঢ়ত্বকে স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া। না কি, মঞ্জরীর উপস্থিতি শীতের আকাশে ফাগুয়ার রং ছড়িয়েছে?

এক ঝলক চিন্তাটা মাথায় ঘুরপাক খেতে, মঞ্জরীর মনে হল অরিজিৎ কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টাই সত্যি। যেটুকু অরিজিৎকে চিনেছে, তাতে মনে হয় না, সে প্রকৃতির সব রং ছেড়ে শুধু শীতের মাধুর্যে ডুবে থাকবে।

হয়ত মন বলছিল ‘বসন্ত আসবে’। তাই শীতের মধ্যেও কোকিলের ডাক শুনতে পেয়েছে। শুধু শোনেইনি, মঞ্জরীকেও শুনিয়েছে। আসলে মনের কোনও এক গোপন গভীরের গুঞ্জন, শীতের মধ্যে কোকিলের কূজন হয়ে ভেসে আসছিল। স্বাভাবিক ঋতুপ্রবাহের বাইরে, অন্য একটা স্পন্দন। সেই স্পন্দনের ভেতরের নিঃশব্দ আহ্বান... মনের ধূসর ক্যানভাসে হারিয়ে যাওয়া। তুলির নতুন টান। তার অতি সেনসিটিভ মনের গভীর আনাচে-কানাচে এক নতুন রাগের ঐকতান।

না, না। বনলতার চোখ দিয়ে অরিজিৎকে দেখেনি মঞ্জরী। মধ্য-চল্লিশের বাসনার লালসা নিয়েও নয়। দেখেছে তাকে, তার মতো করে। অরিজিতের কান দিয়ে সে শুনেছে, পাখিদের না-শোনা কলতান। ওর মধ্যেই সে খুঁজে পায় তার অর্থহীন গতানুগতিক জীবনের শিক্ষিত অনুভূতির অন্য এক প্রাণ। নিজের না-গাওয়া ছন্দের ধ্বনি। তার একান্ত একাকী নিভৃত সুপ্ত পরিতৃপ্তির খনি। মৃদুমন্দ স্পর্শে অরিজিৎকে ফিরিয়ে দেবে ওর হারিয়ে যাওয়া গান। একমাত্র অনুরাগী প্রাণ। সারাজীবনের পুঞ্জীভূত নিভৃত অভিমান।

মঞ্জরীর কাজলকালো চোখে স্নিগ্ধতার আবেশ “সে আসবে”

“কে?”

“বসন্তের কোকিলের ডাক যখন শীতে শুনতে পাচ্ছ, মানে সে আসবে”

অরিজিৎ মঞ্জরীর দিকে ফিরে, আবার বলল “কে?”

“কে আবার? তোমার মেয়ে শ্রাবস্তি”

কিছুটা বিরক্ত হয়েই অরিজিৎ বলল “আমাকে কষ্ট দিতে তোমার বড় ভালো লাগে, তাই না?”

ন্যাচারাল সেটিং দাঁতে, মুচকি মিষ্টি হাসি “দুঃখ দেব কেন? যা মনে হল, তাই বললাম”

উদাসীন, আকাশে ভেসে বেড়ানো পায়রার ঝাঁকের দিকে চেয়ে অরিজিৎ - কেমন ডানা মেলে নিশ্চিন্তে ভেসে বেড়াচ্ছে... অনন্ত আকাশে।

বাধা-বন্ধনহীন স্পন্দে পাল-ছেড়া আনন্দে। হয়ত আকাশে ওড়া পাখিদের মধ্যে কোনও উড়োজাহাজ দেখতে পেয়েছে। উড়োজাহাজ!

ছোটবেলার মতো বিদেশে পাড়ির স্বপ্ন নয়... একটা স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এটাই তো জীবন-সায়াহ্নে একমাত্র আশা। শেষ ক’টা দিনের স্বপ্ন নিয়ে, জীবনকে আবার নতুন করে

ভালোবাসা।

অরিজিৎ ভাবছে ওয়ান্স আই হ্যাভ হেলপড হার টু টেক দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইন লাইফ। আই হোপ সাম ডে সি উড হেল্প মি টু টেক মাই লাস্ট।

****

স্টিভ ওয়াজ লাইক এ গড সেন্ট গিফট।

সাডবেরি হিলে থাকা, হ্যারোর ইটন থেকে পাশ করা, পোরশে ৯১১ কনভার্টিবল নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, স্টিভ জেফারসন যে কেন ক্যান্টারবেরির সাইমন ল্যাংটন গ্র্যামার স্কুল থেকে পাশ, অস্টারলির স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে বাস, সেকেন্ড জেনারেশন ইন্ডো-ব্রিট শ্রাবস্তির সঙ্গে ডেট করতে গেল, সেটাই আশ্চর্য। ইউসিএইচ তাদের এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছিল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। দুজনেই হবু ডাক্তার।

গাওয়ার স্ট্রিট দিয়ে পা চালিয়ে ওরা চলে যেত ইউস্টনে। সেখানে ওর পেটুকের মতো রসগোল্লা গেলা দেখে হাসি থামাতে পারেনি শ্রাবস্তি।

"ইটজ হাই ক্যালরিজ স্টিভ"

"হু কেয়ার্স? ইট ইজ সুইট। আই লাইক দ্য সুইট থিংস ইন লাইফ", একটু থেমে বলেছিল "ইন্ডিয়ান ফুড অ্যান্ড ইন্ডিয়ান গার্লস আর অলওয়েজ সুইট"

শ্রাবস্তি সুইট কি না জানে না। রংটা কালো হলেও, বাঙালি মেয়েদের একটা নিজস্ব লালিত্য সেই সঙ্গে মনন আছে, যদি চোখ থাকে তাকে দেখার। যদি মন থাকে শোনার। বাঙালির একটা নিজস্ব সাংসারিক মাধুর্য আছে। যদি ইচ্ছে থাকে ঘর করার।

স্টিভ কী দেখেছিল, কে জানে? কিন্তু ওয়েস্টএন্ডে বসে সময় নষ্ট না করে, টটেনহাম কোর্ট রোডে বাজার না সেরে, হাইড পার্কে জলাশয়ের পাশে শ্রাবস্তির সঙ্গে নিঃশব্দে হেঁটে, বেইসওয়াটারের খানস-এ মোগলাই খেয়ে বাড়ি ফেরাই বেশি পছন্দ করত। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে খোলা আকাশের মধ্যেই মুক্তির স্বাদ।

উইকেন্ডে লং ড্রাইভে বেড়িয়ে পড়া। ব্রাইটনের সমুদ্রতটে অনির্দিষ্ট পায়চারি... জনবহুল লন্ডনের কংক্রিট জঙ্গলের মধ্যে হাইড পার্কই একটু অবকাশ। একটু আকাশ। খোলা বাতাস। বেঁচে থাকার শ্বাস। ব্যস্ততায় ভরা লন্ডনে, তাসের দেশে একটু আশ্বাস। সেই আশ্বাসের মধ্যেই মনকে খোঁজার প্রচ্ছন্ন বিলাস।

সারাদিন নিরবচ্ছিন্ন তাসের দেশে জীবনের ফাঁকে মন কখনও উদাসী জিপসি। সাদা রাজহাঁসের মতো ডানা মেলে অসীম অনন্ত নীলিমায়। একটু আকাশ, অল্প মাটি, সামান্য রং, মনের মতো পাওয়া মুহূর্ত। সেখানে গান, কবিতা, ছবি, সাহিত্যর ছোঁয়া। আছে মনের বাইরে বেরিয়ে মনটাকে দেখার অবসর। ঠিক যেন স্যাক্রে ক্যুর ছেড়ে মনমার্টের রাস্তায় হাঁটা... অথবা সেন্ট মার্কস স্কোয়ার থেকে ছিটকে পিয়াজালা রোমার পাশে চুপচাপ বসে থাকা। ছন্দহীন জীবনে অন্তহীন আকাশ। মনের সিটাডেলে বরণ করার বিকাশ। তার মধ্যেই নিজেকে খোঁজার ছোট্ট প্রয়াস।

শ্রাবস্তিকে বলেছিল "আই অ্যাম টায়ার্ড অফ দিস সো কল্ড এলিট ওয়ে অফ লিভিং। দেয়ার ইজ ভেরি লিটল স্পেস আউটসাইড দ্য সো-কল্ড প্রোটোকলস"

স্টিভের দিকে ফিরে শ্রাবস্তি বলেছিল "হোয়াটস দ্য হার্ম? আফটার অল, উই আর সিভিলাইজড বিইংস। দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম প্রোটোকল"

"ইন দ্য রেলমস অফ দ্য প্রোটোকলস, কান্ট থিংক"

একটা অর্থহীন যন্ত্রবাক্স, আমাদের চিন্তাকে বাক্সবন্দি করে দেয় চার দেওয়ালের আনাচে-কানাচে। যেখানে পুঁথিগত অর্থহীন প্রলাপ, বারবার ধাক্কা মারে বুকে। যেখানে সংস্কৃতি আর অপসংস্কৃতি সংশয় জাগায় না মূল্যবোধে। সেখানেই একটুকরো অবসর। বিনোদনের উপায় খুঁজতে বাধ্য করে। মাঝে মাঝে কোনও এক

সন্ধেকে নিজের করে পাওয়া। সেখানে গ্ল্যামারের অর্থহীন প্রলাপ নেই। নেই বিকিকিনির মশলা। আছে শুধু মনকে বরণ করে নেওয়া। আছে মনের পসরা সাজিয়ে নৈবেদ্য ভরে নতুন রূপে সেজে ওঠা।

স্টিভের সঙ্গে সেই অবসরই তো শ্রাবস্তির দোসর। হোক না সে ইটনে পড়া খোদ সাহেব। মনটা তো আর অক্সফোর্ড স্ট্রিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। বাইরেও কিছু পেতে চায়।

একটা অনুভূতি।

একটা পাওয়া।

কলেজের ফাঁকে শুরু হয়েছিল নতুন গান গাওয়া।

রং, দেশ, অরিজিন ভুলে একটু চাওয়া। অনুভূতির ছন্দে, আবেগকে বড় কাছ থেকে পাওয়া...

হাইড পার্কের ঘাসে পা ফেলে স্টিভ বলত "লাভ ইন্ডিয়ান ফুড, ইন্ডিয়ান মিউসিক, ইন্ডিয়ান ড্রেস"

"অ্যান্ড মি?" শ্রাবস্তি প্রশ্ন ছুড়েছিল।

"অবভিয়াসলি ইউ টু। ইটজ বিকস অফ ইউ"

শ্রাবস্তি বুঝতে পারত না, এটা কি খোদ ব্রিটিশের মন জোগানো কথা? এর মধ্যে কি কোথাও কলোনিয়াল কালচারের খোলসটা পরা? বুঝতে পারত না, স্টিভ ইন্ডিয়ান সব কিছু ভালোবাসে, না ইন্ডিয়াকে।

ইন্ডিয়াকে শ্রাবস্তি দেখেনি। মা দেখতে দেয়েনি। আর পাঁচটা সেকেন্ড জেনারেশন ব্রিটিশের মতো তার নেচারটাকে ব্রিটিশ ছন্দে রং মাখিয়ে ব্রিটনিক রুটলেস ইন্ডিয়ানদের মতোই জেনেছে, ওয়েম্বলি থেকে সাউথহল চত্বরে। সেখানে ইন্ডিয়া, বলিউড আর কারি হাটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ডেভিডের ক্ষমতা ছিল না মায়ের ওপর কথা বলার। বলতেও চায়নি। তবুও কোথায় জন্ম-জন্মান্তেরর টান। ঠিক কোথায়, বুঝতে পারত না।

শ্রাবস্তিকে স্টিভ বলত "ডু ইউ ওয়ান্ট টু গো টু ইন্ডিয়া?"

চিজুইক রাউন্ড-অ্যাবাউট থেকে অস্টারলির দিকে, পোরশে ৯১১ কনভার্টিবল ড্রাইভ করার সময় পাশে বসা শ্রাবস্তির কাছে শুনত, তার মায়ের শেখানো নির্লিপ্ততা "হোয়াট ফর? আই অ্যাম সিওর আই ক্যান সি ইন্ডিয়া হিয়ার টু। উই হ্যাভ গট মোর কারি আউটলেটস দ্যান ইন্ডিয়া। ইউ গেট ইন্ডিয়ান ফুড ইভন অ্যাট সেইন্সবেরিস, অ্যাসডা অর ইভেন মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সর। আই হ্যাভ সিন এ ফিউ ফিল্মস ইন লেস্টার স্কোয়ার। উই সি অমিতাভ বচ্চন, শারুখ খান অ্যান্ড জন আব্রাহাম অ্যাট দ্য ওয়েম্বলি"

শ্রাবস্তির মনে হত, লন্ডনের এই ইন্ডিয়ান কালচারের মধ্যেই সে ইন্ডিয়াকে পেয়েছে। ভারতীয় বিদ্যা ভবনে ক্লাসিক্যাল ইন্ডিয়ান ডান্স ভরতন্যাট্যম, কত্থক, মণিপুরি। তাহলে ইন্ডিয়া গিয়ে কী হবে? মাকে অসন্তুষ্ট করা ছাড়া।

****

রঞ্জিতা আর পাঁচটা স্বপ্ন-দেখা বাঙালির মতোই বড়ো হয়েছে। মা শিখিয়েছে, পুবকে ভুলে পশ্চিমকে বরণ করতে। জন্ম ঈশ্বরের দান হলেও, কর্ম নিজের হাতে। তাই লেক গার্ডেন্সে আবদ্ধ না থেকে জীবনটাকে স্বপ্নের জোয়ারে ভাসিয়ে আঁকড়ে ধরার আশা। অস্তিত্ব বিপন্ন করে স্বপ্নকে বরণ করেছে। বাস্তবে সার্থকতায় সাজতে। জগৎটা দেখতে হলে, অরিজিৎকে ছেড়ে ডেভিডকে ধরতে ক্ষতি কী? ক্যালকাটা ইজ পাস্ট। ইন্ডিয়া ইজ পাস্ট। সে চায়নি, শ্রাবস্তি দেশি অতীতেই আবার ফিরে যাক।

বেশ কয়েক বছর আগে, শ্রাবস্তি বলার চেষ্টা করেছিল "আই ওয়ান্ট টু গো অ্যান্ড মিট মাই ড্যাড"

রঞ্জিতা মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠেছিল "হোয়াট ফর? ইউ হ্যাভ টু গো ফরোয়ার্ড। নট লুক ব্যাক। নেভার এভার মেনশন অফ গোয়িং ব্যাক টু ইওর পাস্ট"

তারপর আর সাহস পায়নি। মায়ের মেজাজ অজানা নয়। তার থেকে ডেভিডও বাদ নেই।

"কান্ট ইউ ড্যু দ্য ডিসেস?"

“ইউ ক্যান পুট দেম ইন দ্য ডিসওয়াশার”

“সিওরলি নট ফর থ্রি প্লেটস। কাম অন ডেভিড, ইউ আর ড্যাম লেজি”

সাহেবকে দাস করার মধ্যে আলাদা মানসিক তৃপ্তি। ওরা সারা বিশ্বকে দাস করেছে। সেই অ্যাংলো-স্যাক্সন ব্রিডকে পায়ের তালায় রাখাই অ্যাচিভমেন্ট। যা গান্ধিজি পারেননি, রঞ্জিতা পারে।

ভালোবাসার অনেক রূপ আছে। এ অন্য রূপ। দেবী দুর্গার মতো নানা রূপে আত্মপ্রকাশেই তো নারীত্বের পূর্ণতা। রঞ্জিতা পূর্ণ নারী হতে চেয়েছে। তাণ্ডবে লিপ্ত রক্ষাকালী শিবের বুকে পা ফেলে লজ্জা পেলেও, রঞ্জিতা বাঙালি মায়ের চিন্ময়ী রূপটাকে উপেক্ষা করেই শ্রাবস্তিকে দেখাতে চেয়েছে, তার বিদেশের মাটিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে।

সাকসেস ইজ দ্য কি অফ মর্ডান সিভিলাইজেশন। সেটা অর্জন করা যায় না বাই সাবমিশন। তাই ডমিনেশন।

ডেভিড হয়ত পারত। তার আগেই রঞ্জিতা ব্যঙ্গ করে ডেভিডকে বলেছে “হি লিভস ইন হিস ক্যান্টারবেরি টেলস” ক্যান্টারবেরি টেলসের মায়াডোরে ঘেরা, বড়লোক সুপুরুষ রঞ্জিতার থেকে কম শিক্ষিত ডেভিড তো আর শ্রাবস্তিকে অন্য কোনও মন্ত্র দিতে পারবে না? কেনই বা? শ্রাবস্তি তার মেয়ে নয়, রঞ্জিতার মেয়ে... স্টেপ ডটার।

শুধু একবার মিনমিন করে বলেছিল “জিতা, লেট শাবি ড্যু হোয়াট সি প্রেফার্স”

“লেট হার স্টপ থিংকিং অ্যাবাউট আদার থিংস। অ্যান্ড পারসিউ হার মেডিক্যাল কেরিয়ার। দ্যাট ইজ মোর ইম্পরট্যান্ট ফর হার লাইফ, দ্যান থিংকিং অ্যাবাউট হার থিওরিটিক্যাল ফাদার অফ দ্য পাস্ট, হু ডেসার্টেড হার” রঞ্জিতা ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল।

ডেভিড আর কথা বাড়ায়নি। শ্রাবস্তি চুপ করে গেছে। তার কিছুই করার নেই। মা যা বলবে, শুনতে হবে। এর বাইরে, শ্রাবস্তির আর কে আছে?

****

স্মৃতির জলসাঘর ছেড়ে বাস্তবের আঙিনায় দাঁড়িয়ে আর পেছনে দেখতে চায়নি অরিজিৎ বসু। অতীত তো আর ফিরে আসবে না। বর্তমানকেই পাথেয় করে বাঁচতে হবে।

হাই কোর্টে সারাদিন যুক্তির বন্যা বইয়ে, সন্ধেবেলা মঞ্জরীর হাত ধরে তারা গোনার মধ্যে অরিজিৎ খুঁজে নিয়েছিল বিচ্ছিন্ন জীবনে এক-টুকরো আশ্বাস। বাঁচার একমাত্র বিশ্বাস। সম্পর্কের মায়াজালে, সৎ-অসতের দোলায় না দুলে, শুধু চিরন্তনের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে। তাই বার অ্যাসোশিয়েশনের মিটিং-এর ফাঁকে শশাঙ্ক যখন কালো কোটটা ঠিক করে ওকে প্রশ্ন করেছিল “ডোন্ট ইউ এভার গেট বোরড?”

অরিজিৎ মুচকি হেসে বলেছিল “একেবারেই নয়। অস্থায়ী সম্পর্কের জের না টেনে, একা পৃথিবীতে বেশ আছি। গান শুনি, গল্প পড়ি, রেস্টুরেন্টে খাই। মাঝে-মধ্যে, এক-আধটা সিনেমাও দেখি। বোর হব কেন? সব সময় খুশি হওয়ার জন্য মানুষের প্রয়োজন নেই। নিজের মধ্যেও খুশি হওয়া যায়”

“তবুও... মাঝে-মাঝে কি মনে হয় না, পাশে কেউ থাকলে ভালো ছিল?”

“চিরদিন তো কেউ থাকবে না। আসবে, যাবে। এই আসা-যাওয়ার খেলা চলতেই থাকবে। কিন্তু তখনও আমি থাকব”

শশাঙ্কর বউ-বাচ্চা পরিবেষ্টিত খোলস-ঢাকা অ্যাপার্টমেন্টের আবদ্ধতায় বাইরের পৃথিবীটা অচল। তাই অরিজিতের একাকী জীবন তার ভাবনার অতীত। এরা সৌভাগ্যবান। জীবনের ক্ষুদ্রতম বলয়ের মধ্যে নিজেকে অর্থপূর্ণ প্রমাণ করে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেই এদের তৃপ্তি। ওদের বাঁচাটা শুধু মুহূর্তের জন্য।

কেবল অরিজিতের মতো কিছু হতভাগ্য জীবন-সমুদ্রের ঘূর্ণিঝড়ে ছিটকে পড়ে, মহাশূন্যে ভেসে ভেবে চলেছে... মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী। তার আগে, একটু বেঁচে নিই। বুক ভরে শ্বাস। মনের মতো করে একটিবার।

"তোমার মতো আঁতলামো করে আমার জীবন চলবে না। আমাকে সুপর্ণার কথা, পিউর কথা ভাবতে হবে"

ভাবনার কী কোনও শেষ আছে? না ভাবলেই কী নয়?

মঞ্জরীর ছোঁয়ায় মিষ্টি আবেশ। কলেজ জীবনে সুপর্ণার প্রেমের সেই স্পর্শটুকু হারিয়ে গেছে। এখন জীবনটাই বেশি মধুর।

শশাঙ্ককে বলল "ভাবার জন্য তুমি আছ। আমার মতো কিছু বাউন্ডুলে নয় নাই ভাবল। মুহূর্তটাকে অনুভব করে যাব নিজের মতো করে"

উদাস মঞ্জরী একদিন খোলা আকাশে চেয়ে বলেছিল "সম্পর্কটা কিছু নয়। মুহূর্তটাই আসল"

কোনটা আসল, কোনটা নকল, অরিজিৎ জানে না। শুধু জানে, এভাবেই চলতে হবে। এটাই তার পাথেয়।

মঞ্জরীরকে বলেছিল "মুহূর্ত নয়, অনুভূতিটা। ওই যে দূরের মেঘগুলো নিজের মনে ভেসে বেড়াচ্ছে, তার খবর ক'জন রাখি? কার সময় আছে পায়রারা কোনদিকে উড়ে যাচ্ছে, খবর রাখতে?"

"ওই রাখতে-ঢাকতে-গড়তে-জুড়তেই জীবনটা পার করে দিলাম"

অরিজিৎ ফিরে তাকাল মঞ্জরীর কচি কলাপাতা টাঙ্গাইল শাড়ির দিকে "এটা কে কিনে দিয়েছিল? কর্তা?"

"হ্যাঁ। যখন বেঁচেছিল" মঞ্জরী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অতীতকে ফেলে আসতে চাইছে।

"সেটাও তো একটা পাওয়া"

নিঃশব্দ মঞ্জরী। পাওনা-গন্ডার হিসেব মেলাতে তো অরিজিতের সঙ্গে বসেনি। মেলাতে গেলেই হারানোর ক্ষোভ বারবার ফিরে আসে। অরিজিতের সঙ্গে নিঃশব্দ মুহূর্তগুলো তার কুয়াশাচ্ছন্ন পৃথিবীতে সোনালি আলোর রেশ। সেই মাদকতাকে পাওয়া না-পাওয়ার হিসেবে মেলাতে চায় না। পেলেই হারাতে হবে। না পেলে আর হারানোর নেই।

নিস্তব্ধতা ভেঙে অরিজিৎ বলল "শ্রাবস্তি ফোন করেছিল"

"কোত্থেকে?"

"ইউকে থেকে বোধহয়। জানি না ঠিক কোত্থেকে। বলল আসবে"

অরিজিতের ভারী চশমার দিকে তাকিয়ে বলল "সেদিন বলেছিলাম না, মন বলছিল, শীতে বসন্তের কোকিলের ডাক শুনেছি। এ হওয়ারই ছিল"

"কী হওয়ার ছিল জানি না। সে আসছে বাবার কাছে ফেলে আসা সতেরো বছরের হিসেব বুঝতে"

"তুমি তৈরি?"

"তৈরির কী আছে? সত্যি বলার জন্য তো তৈরি হতে হয় না? মন থেকে বেরিয়ে আসে"

মঞ্জরীর মনে হল, সত্যি বলবার জন্য না হলেও, সত্যের মুখোমুখি হওয়ার জন্য, কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন।

মঞ্জরী পারেনি। শুধু মনের গভীর গোপনে অরিজিতের মেয়ের প্রতি সুপ্ত অনুভূতির মতো, ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। ঘুমের মধ্যেই শান্তি। জাগলেই এখনকার বেঁচে থাকার শান্ত-স্নিগ্ধ রেশটুকুও হারিয়ে যায়। জাগিয়ে কী লাভ?

যেমন একদিন নিজের সাজানো জীবনটা হঠাৎ-ই ওলট-পালট হয়ে গেছিল। প্রস্তুতির কোনও অবকাশই ছিল না। এখন অরিজিতের হাত ধরে একাকিত্বের মধ্যে, বেঁচে থাকার রসদ সাজিয়ে নিয়েছে।

আকাশে ভাসা মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল "দেখ দেখ মেঘ কেটে যাচ্ছে। শীতকালে তো আর বৃষ্টি হয় না"

“হতেই পারে। শীতকালে তো আর কোকিল ডাকে না। তবুও কোকিলের ডাক শুনেছি”

“তুমি অনেক কিছু শুনতে পাও, যা অন্যেরা পায় না। অনেক কিছু দেখতে পাও, যা অন্যেরা পায় না”

অরিজিতের মনে হল, এটাই বাইরের ঘূর্ণিঝড়ের আত্মপ্রকাশ। কিছু ঘটবার আগে, সব নিয়ম ওলট-পালট হয়ে যায়।

****

মা আপত্তি করেনি। করবেই বা কেন? পাত্র যখন ডাক্তার, বনেদি বড়োলোক বাড়ির একমাত্র সন্তান, আপত্তি করার কোনও কারণ নেই। তার ওপর, শ্রাবস্তি নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করতে চেয়েছে। তাও খোদ সাহেব। যে সে নয়, ইটনে পড়া। নিজে যখন লেক গার্ডেন্স থেকে ক্রস-ম্যারেজ করেছে, সেকেন্ড জেনারেশন ইন্ডো-ব্রিটিশ শ্রাবস্তি যে করবে, এটাই স্বাভাবিক।

তবুও শ্রাবস্তির দ্বিধা ছিল।

স্টিভেকে বলেছিল “ইওর ড্যাড?”

স্টিভ ওর কাঁধটা জড়িয়ে বলেছিল “ইনিশিয়ালি হি হ্যাড সাম রিসার্ভেশন্স। বাট আই এক্সপ্লেনড টু হিম, আই ওয়ান্ট টু ম্যারি ইউ। হি আন্ডারস্টুড। ডোন্ট ওয়ারি। ইটজ আওয়ার লাইফ”

শ্রাবস্তি নিজের পৃথিবী গড়তে চাইছিল মায়ের ডমিন্যান্সের বাইরে। স্টিভ দিয়েছিল কনফিডেন্স। তেইশ বছরের শ্রাবস্তির কাছে নতুন জীবনের দূত। নতুন ছন্দে, নতুন আনন্দে। খাঁচা ছেড়ে হারিয়ে যাওয়ার অন্য দিগন্তে।

তবুও সংশয় কাটে না। স্টিভকে প্রশ্ন “অ্যান্ড ইওর মাম?”

“সি ইজ মোর অফ এ সোসালাইট। হোয়ার হ্যাজ সি দ্য টাইম, টু পন্ডার ওভার মাই ইমোশনস?”

তবুও শ্রাবস্তির মনে হয়েছিল, সি কুডন্ট এক্সপেক্ট অ্যান এশিয়ান অ্যাস হার ডটার ইন ল্য। আফটার অল, দ্য ব্লু ব্লাড ডস গিভ এ ফলস সেন্স অফ প্রাইড। কী আর করা যাবে?

ইন্টারন্যাশনাল ডায়মন্ড এক্সপোর্টার স্টিভের বাবার অর্থেই তার এই সোশাল আইডেন্টিটি। ইফ হার হাসব্যান্ড ক্যান অ্যাক্সেপ্ট, অ্যান্ড হার ওনলি সান ওয়ান্টস টু ম্যারি, হু ইজ সি টু ইন্টারফিয়ার? আফটার অল, সি ডাসন্ট বিলং টু দ্য প্রফেশনাল সোশাল মিডিওক্রিটিস অফ দ্য মেডিক্যাল কমিউনিটি। ইট ইজ দেয়ার লাইফ। লেট দেম বি হ্যাপি।

ইফ স্টিভ ক্যুড ব্রেক দ্য ট্র্যাডিশনস বাই পারসুয়িং এ মেডিক্যাল কেরিয়ার, ইট ইজ ইমপ্যারেটিভ, দ্যাট হি উইল ব্রেক মেনি মোর ট্র্যাডিশন্স অফ দ্য ব্রিটিশ ক্লাস। লেট হিম লিভ দ্য লাইফ হি প্রেফার্স। গ্র্যামার স্কুল আর পাবলিক স্কুল তো সমান নয়। সি নিউ শ্রাবস্তি ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট। দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগেস্ট স্কোর ইন হার সোসালাইট মিলিউ।

দ্য এনগেজমেন্ট ওয়াজ সেলিব্রেটেড বাই বোথ জয়নিং ইন দ্য ওপেনিং অফ এ বটল অফ ডম পেরিডন। দিস ফলোড দ্য গালা রিসেপশন অ্যাট দ্য গ্রোসভেনার হোটেল। শ্রাবস্তি ম্যারেড স্টিভ উইথ অল দ্য পম্প অ্যান্ড গ্র্যাঞ্জার। এ ম্যারেজ, হুইচ দ্য ওয়াটারশন ফ্যামিলি উড রিমেমবার।

গড়ে উঠল, ছোট্ট আস্তানা হ্যাম্পটন কোর্টে। স্টিভ আর শ্রাবস্তির ভালোবাসার নীড়। স্বপ্নের নীড়। নতুন স্বপ্নের অবগুণ্ঠন খুলে আগামী দিনের নতুন মায়াবি স্বপ্ন হাত ধরে টানল। অনাবিল পাওয়ার আনন্দের জোয়ারে। সুখের স্বপ্ন-সাগরে। নতুন ভালোবাসার সপ্তম নিখাদে।

রঞ্জিতা যেন সামাজিক স্তরে আরেক ধাপ এগিয়ে। এ শুধু শ্রাবস্তির বিয়ে নয়। তার সামাজিক উত্তরণ। ডেভিডের ছোট্ট ক্যান্টারবেরির পৃথিবী থেকে লন্ডনের এলিটে পর্দাপণ। সেই সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পার হয়ে যেত তার একাকী নিশিযাপন।

****

অরিজিৎ দমদম এয়ারপোর্টে শ্রাবস্তিকে রিসিভ করতে গেছিল। নিজের মেয়েকে চিনতে পারবে তো? ছোটবেলায় ফেলে আসা ছোট্ট শ্রাবস্তির মুখটার স্মৃতি বুকে করে, নেতাজি সুভাষ ইন্টারন্যাশনালের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসা জনস্রোতকে দেখছিল অরিজিৎ।

ফোনের পর শ্রাবস্তি অবশ্য বেশ কয়েকটা ই-মেল করেছে। ই-মেলে ছবিও পাঠিয়ে দিয়েছে। শেষ পাঠানো শ্রাবস্তির ছবির বেশভূষা অরিজিতের পছন্দ না হলেও, ছবিগুলো মোবাইলেই। বেশভূষা নিয়ে খুব একটা মাথা না ঘামালেও, মুখের ভাবভঙ্গির মধ্যে ছোটবেলায় ফেলে আসা সরলতা নেই। অন্তরের গভীর সংশয় প্রকট। ছবিটা মনে গেঁথে গেছে।

বহুদিনের পুঞ্জীভূত আবেগে চশমায় ঢাকা চোখটা ঝাপসা। কয়েক মুহূর্ত।

"ইউ আর মাই ড্যাড, আরেন্ট ইউ?" পেছন থেকে টিপিক্যাল ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট শুনে বুকটা কেঁপে উঠল। না দেখেও মন বলে দিল, এ আর কেউ হতে পারে না। একমাত্র শ্রাবস্তি। জন্ম-জন্মান্তরের নাড়ীর বন্ধনকে চিনিয়ে দিতে আকার লাগে না। ভাষাও নয়। পরিচয় মনে। শুধু অনুভূতি দিয়ে চিনে নেয় তার হারিয়ে যাওয়া শ্রাবস্তিকে।

একবার বারবার বহুবার। চোখ জুড়ে। বুক ভরে। ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে। মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছে না। ভাষা স্তব্ধ, মৌন অনুভূতির মিছিল।

"অফ কোর্স"

চোখের জলে বুকে জড়িয়ে নিল একমাত্র মেয়েকে। চশমাটা ভিজে গেছে। ঠোঁট থর-থর কাঁপছে। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে ব্যথাভরা সুখে। ভাষাহীন নীরব অন্তরের অনুভূতির প্লাবনে। জনবহুলতার মধ্যেও মৌনতায়। নিজস্ব দুনিয়ায়। জনস্রোতের মধ্যে যখন যাত্রীরা আপনজনকে চিনে গন্তব্যে পাড়ি দিতে ব্যস্ত। কার-ই বা সময় আছে, ফেলে আসা অনুভূতি রোমন্থনের দিকে ফেরার?

সম্বিৎ ফিরল একটি ছেলের গলায় "বাবু আমার গাড়িতে যাবেন?"

অরিজিৎ ফিরে দেখল, শ্রাবস্তির বয়সি একটি ছেলে অরিজিতের দিকে চেয়ে। চোখে কাতর মিনতি।

"আমাদের গাড়ি আছে" বিষণ্ণ ছেলেটাকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে দেখে, মায়া হল।

"অন্য কেউ যদি যায়"

"কেউ যাবে না বাবু। সবার তো কলকাতায় কেউ না কেউ চেনা আছে। ফরেনাররা আমাদের গাড়িতে ওঠে না। প্রি-পেড ট্যাক্সি নেয়। আমার-ই দুর্ভাগ্য। সাতসকালে বউনি হল না"

"কত কামাতিস?"

"তিনশো টাকা"

পার্স থেকে তিনশো টাকা দিল "অন্য কোনও সোয়ারি দেখ। আমার প্রয়োজন নেই"

টাকা নিয়ে ছেলেটি বুঝতে পারল না বাবুটা পাগল কি না। সেলাম ঠুকে চলে গেল। এরকম পাগল পৃথিবীতে আজ-ও আছে বলেই পৃথিবী থেমে যায়নি। নইলে যে কী হত? শ্রাবস্তির ট্রলিটা ঠেলতে ঠেলতে বলল "ওয়েট এ মিনিট। ড্রাইভারকে ফোন করছি গাড়ি আনাতে"

****

জেট ল্যাগের জন্য ঘুম আসছে না। বাবার এখন মধ্য রাত্রি হলে, শ্রাবস্তির সন্ধে। দ্য পাবস মাস্ট স্টিল বি বিইমিং উইথ লাইফ। স্টার্ট অফ এ উইকেন্ড ইন লন্ডন। এস্পেসিয়ালি দ্য ওয়েস্ট এন্ড।

শ্রাবস্তি কলকাতায় কেন এসেছে?

আধা চেনা কিংবা না-চেনা পিতৃ-মাতৃভূমি দেখতে?

হারিয়ে যাওয়া সত্যিকারের বাবাকে খুঁজতে?

ছোটবেলার না-পাওয়া পরিবারের কৈফিয়ত চাইতে?

তার মধ্যে স্টিভের ভারতীয় নারীকে না-পাওয়ার ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে? শেষ অবধি কী নিজেকেই খুঁজতে!

স্টিভের কথা মনে হতেই বুকটা কেঁপে উঠল হারানোর ব্যথায়। কত ভালোবেসেছিল। একটু আশা। বুকভরা ভালোবাসা। সেই ছিল জীবনের একামাত্র অভিলাষা।

ডেভসে হনিমুনে, বরফের মধ্যে, স্কির স্লোপে, তীব্র বেগে গ্লাইডারে ভেসে বেড়াতে, ওর মনে হয়েছিল স্টিভ শুধু স্বপ্ন নয়, ভেসে বেড়ানোর নতুন দিগন্ত।

"এনজয়িং দ্য ট্র্যাঙ্কুইলিটি অফ দ্য ভাস্ট এক্সপ্যানস অফ দ্য অ্যাল্পস?"

"দ্য ফিল অফ ইউ অ্যারাউন্ড"

আজ সে অনুভূতি মলিন। বাবার সল্ট লেকের তিনতলা বাড়িতে অসহায়। একটা শূন্যতা। নিস্তব্ধ অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ছকে বাঁধা রাস্তা। যে পথে সে আর পা বাড়াতে চায় না।

মা বলেছিল "নেভার মাইন্ড। ইট হ্যাপেন্স ইন অল অফ আওয়ার লাইভস"

অরিজিৎ বসুকে ছেড়ে, ডেভিডকে ধরাটা বড় কোনও ব্যাপার নয়। কালকে ডেভিডের বদলে মার্টিনও হতে পারত। গণ্ডিটা চেনা-জানা ফার্মি স্পিয়ারের মধ্যে আবদ্ধ। লাইফ হ্যাজ গট ইটস আপস অ্যান্ড ডাউন্স।

সেই জগৎটাকেই দেখে এসেছে শ্রাবস্তি। তাই স্টিভ যখন বলেছিল "টেল মি মোর অ্যাবাউট ইন্ডিয়া"

শ্রাবস্তি জানত না কী বলবে। তার কাছে ইন্ডিয়া মানে আধা-সাহেব বাঙালি মা। কালো রঙের মোড়ক ঢাকা সাউথহলে তন্দুরি এক্সপ্রেস অন জেলেবি জাংশনে, রুটি-মাংস কিংবা জিলিপি খাওয়া। কিংবা ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে বলিউড এক্সট্রাভ্যাগ্যাঞ্জা। মা তো তাকে আর কোনও ইন্ডিয়াকে চিনতে দেয়নি।

"নেভার বিন টু ইন্ডিয়া। বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ হিয়ার"

"আই নো। ডিডন্ট ইউ এভার ফিল লাইক ভিসিটিং ইওর নেটিভ মাদারল্যান্ড?"

কী বলবে, জানে না শ্রাবস্তি। কিছু বলতে গেলে, মাকে ছোট করা। একটু হেসে দিগন্ত বিস্তৃত অ্যাল্পসের দিকে তাকিয়ে "ডিডন্ট গেট দ্য অপারচুনিটি"

স্টিভও পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলল "স্যাড। সিন বিউটিফুল পিকচার্স অফ ন্যান্ডাডেভি অ্যান্ড ন্যান্ডিকুন্ড। হোপ টু গো দেয়ার সামডে"

কীসের ইন্ডিয়া? কোন ইন্ডিয়া? শ্রাবস্তি তো সে ইন্ডিয়াকে দেখেনি। ছবিও নয়। ইংল্যান্ডের বাইরের ইন্ডিয়া অচেনা।

"ফরগেট ইন্ডিয়া। উই আর ইন সুইটজারল্যান্ড"

স্টিভ বিষণ্ণ "রিয়েলাইজ দ্যাট"

ভারতীয় বংশোদ্ভূত সদ্য বিবাহিত শ্রাবস্তি পাশে থাকতেও যেন সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে তুষারাবৃত অ্যাল্পসের পর্বতমালার অসীমে। অ্যাল্পসের বাইরের বিপুল পৃথিবী অজানা। ঘরেও তার ছোঁয়া নেই।

স্টিভ থেকে বাবা। ইংল্যান্ড থেকে ইন্ডিয়া। চেনা পৃথিবী থেকে অচেনায় পাড়ি। অনেক প্রশ্ন নিয়ে শ্রাবস্তি চেয়ে রইল সল্ট লেকের অন্ধকার আকাশে। এখানে আকাশ লন্ডনের মতো মেঘাচ্ছন্ন নয়। পরিষ্কার। মাঝরাতে জানলার পাশে বসে তারা গোনা যায়।

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার,

হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর

জেট ল্যাগ আর প্রশ্নের আবর্ত রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কত প্রশ্ন। কত জিজ্ঞাসা। অনেক বেদনায় খুঁজে বেড়ানো অভিলাষা। জন্মদাতার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা। একটা আশা। অনেক দিন না-শোনা, নতুন কোনও ভাষা।

রাতের নিঝুমে ঘুমন্ত জন্মদাতাকে এখন প্রশ্ন করা যাবে না। থাক পড়ে সে সব কালকের জন্য। আজ শুধু একাকী নিঃশব্দে তারার দিকে চেয়ে ফেলে আসা স্মৃতি হাতড়ে বেড়ানো।

****

“এসেছে?” মঞ্জরী কোকিলের ডাক শুনলেও, শীতের জড়তা মাখা একটা নির্লিপ্ততায় অরিজিৎ ফোনে বলল “হ্যাঁ। কাল সকালে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে”

“এখন কোথায়?”

“দোতালায় ঘুমোচ্ছে। ওর এখন মাঝরাত। এখনও জেট ল্যাগ কাটেনি”

“কিছু বলল?”

“এখনও নয়। দম নিচ্ছে। রিকভারিং আফটার দ্য জার্নি। জানা থেকে অজানায় পাড়ি”

“তুমি অজানা? নিজের বাবা!”

“কলিযুগ। তোমার কারমেল কনভেন্ট নয়” একটু থেমে বলল “পরে কথা হবে”

মোবাইল ডিসকানেক্টেড হতেই মঞ্জু বুঝল, ও এখন একা থাকতে চায়। অনেক কথা মঞ্জরীকে বলে দিতে হয় না। অনুভব করতে পারে। রঞ্জিতা যদি পারত। বোঝালেও যে বুঝতে চায়নি, তাকে কী বোঝানো যায়? ওকে বুঝতে শেখানোই হয়নি।

গরিয়াহাটের জুসলা হাউসের রঙিন আলোর ঝলমলানির মধ্যে মালাবদলের পর অরিজিৎ যখন রঞ্জিতার সঙ্গে শুভদৃষ্টি বিনিময় করেছিল, নতুন স্বপ্নে ভরেছিল তার সমস্ত সত্তা। লেক গার্ডেন্সের সদ্য চুনকাম করা দেওয়ালের পাশে ছোট খাটে শুয়ে অরিজিৎ রঞ্জিতার ছোট্ট স্তনের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছিল “খাটটা বড় ছোট”

রঞ্জিতা, অরিজিতের কথার জের টেনে বলেছিল “খাট ছোট হলে কী হবে? জীবনটা অনেক বড়। হাত ধরে ভাগাভাগি করে নেব দু’জনে”

হ্যারডস থেকে সেলফ্রিজের সেল। রয়েল ডল্টন আর এডিনবারা ক্রিস্টালে রঞ্জিতা খুঁজেছিল সদ্য বিবাহিত জীবন। অরিজিতের মিডল টেম্পলের যথসামান্য বেতনে, মিংক কোটের প্রাচুর্যে নিজেকে সাজিয়ে, রঞ্জিতার মনে হত এটাই জীবন। ফিসফিস করে অরিজিতের কানের কাছে মুখ এনে বলত “তোমার মতো স্বামী পেয়ে, আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে”

সম্ভোগের মধ্যে, অরিজিতের মনে হত আর্থিক অনটন থাকলেও, এর মধ্যেই স্বর্গ। তার অন্য নাম স্বপ্ন। তাই নিয়ে বাঁচাই জীবন। সেই পরিণতির অবশ্যম্ভাবী আত্মপ্রকাশ শ্রাবস্তি হলেও, তা শুধু স্বপ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হাতছানি দিয়েও কঠিন বাস্তবের কাছে পরাজিত। অরিজিৎ হেরে গেছে রঞ্জিতার কাছে। না কি, দুটো ভিন্ন সত্তার টানাপোড়েন, যে যার নিজের স্বার্থটাই বড় করে দেখেছিল? তাদের দ্বন্দ্ব যে একটা নির্মল শিশুর ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে, কেউই ভাবেনি। অরিজিতের কিন্তু একবার যে মনে হয়নি, তা নয়।

“একা মেয়ে মানুষ করা সম্ভব নয়” অরিজিৎ প্রতিবাদ করলে তীব্র দাবানলে জ্বলে উঠছে রঞ্জিতা “কেন? এদেশে কত সিঙ্গল প্যারেন্ট ফ্যামিলি আছে। তাদের বাচ্চারা কি মানুষ হচ্ছে না?”

শ্রাবস্তি কী মানুষ হয়েছে? অরিজিৎ জানে না। বিচ্ছিন্ন একটা নির্মল পবিত্র আত্মা, কোন টানে, আজ এত বছর পর, তার কাছে এখানে? কৌতূহল নিঃশব্দে আলোড়ন তুলেছে। আর স্বপ্ন দেখে না অরিজিৎ।

মঞ্জরীকে নিয়েও নয়। প্রথম যেদিন কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরা মঞ্জরী এসেছিল, নিরাভরণ মঞ্জরীকে দেখে মনের কোথাও ঢেউ খেলে গেছিল। কে জানে কেন? নিয়তি কী এভাবেই মুহূর্তে বন্ধন বাঁধে? ঢেউটা আলোড়ন তুলতে পারে।

প্রসাধনহীন মুখের দিকে তাকিয়ে “শশাঙ্ক পাঠিয়েছে?” মাথা নেড়েছিল মঞ্জরী।

“কী ব্যাপার? বলুন” কথায় মিডল টেম্পেলের ছোঁয়া।

“আমি বিধবা” ভণিতা না করেই বলেছিল “গত বছরের রাজধানী এক্সপ্রেসের অ্যাক্সিডেন্টে স্বামী মেয়েকে হারিয়েছি”

“কী হয়েছিল?” অনুকম্পা নিয়ে তাকাল ওর দিকে।

“তিনজন রাজধানীতে কলকাতা থেকে দিল্লি যাচ্ছিলাম। গয়া থেকে দশ-পনেরো কিলোমিটার হবে, অ্যাক্সিডেন্ট! কী করে যে বেঁচে গেলাম, কে জানে? স্বামীর ইনস্ট্যান্ট ডেথ। ওরা ওকেও ডেড ডিক্লেয়ার করেছে, যদিও বডি পাওয়া যায়নি” একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঞ্জরী। ছেড়ে আসা জীবনকে বাস্তবে ফেরাতে বুক ফেটে যাচ্ছে। অনেক সময় সত্যিটাকে উহ্য করে রাখার মধ্যেও শান্তি। ঘুমনো অতীতকে বর্তমানে টেনে তাকে আরও দুর্বিষহ করার মানেই হয় না। অতীত! অতীতের পাতায় তোলা থাক।

বুঝতে পেরে অরিজিৎ বলল “সে কথা ছাড়ুন। আমি কী করতে পারি?”

মঞ্জরীকে অতীত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে বলল “গতস্য শোচনা নাস্তি” মেয়েটার দুঃখের কাসুন্দে ঘেঁটে লাভ নেই। দুঃখ বাড়বে। অশান্তিতে এসেছে। ওর শান্তি চাই।

নিজেকে সামলে মঞ্জরী বলল “ঘর তো গেছে। এখন মাথা গোঁজার আস্তানাটাও যেতে বসেছে”

অরিজিৎ চুপ। চেয়ে আছে ওর দিকে।

“ভাসুর অ্যামেরিকায়। স্বামীর কাজেও আসেনি। এখন বলছে বাড়িটা ছেড়ে দিতে”

“বাড়িটা কার নামে?” চশমাটা টেবলের ওপর রাখল।

“শ্বশুরের। শ্বশুর ওটা ওদের দু-ভাইয়ের নামেই লিখে গেছে”

“শ্বশুর মারা যাওয়ার পর মিউটেশন হয়েছে?”

“বলতে পারব না। উনিই ওসব দেখতেন। আমি কিছু জানি না”

“অরিজিন্যাল দলিলটা আছে?”

“থাকতে পারে। খুঁজে দেখতে হবে”

অতীতটা ফ্ল্যাশ বালবের মতো পলকে জ্বলে উঠে নিভে গেছিল। মঞ্জরীকে বলেছিল “দেখতে হবে ভাগাভাগি করে গেছে কি না। অরিজিন্যাল দলিলটা খুঁজে বের করতেই হবে। আপনার ওখানেই থাকার কথা। ভাশুর যখন আমেরিকায়, ওর কাছে বোধহয় নেই”

মিনতি মাখা চোখে বলেছিল “রাস্তায় দাঁড়াতে হবে না তো?”

মঞ্জরীকে দেখে, ভেতরে আলোড়ন। কেন, বুঝতে পারছিল না। কোনও অদৃশ্য শক্তির যাদু। সেই ছন্দের রাগে বলেই ফেলতে পারত “আমার তিনতলা বাড়ি। আপনার মাথা গোঁজার কোনও অভাব হবে না” কিন্তু এক অজানা অচেনা ভদ্রমহিলাকে তো সেকথা বলা যায় না। তাই আশ্বস্ত করতে বলল “আমি তো আছি”

ছোট তিনটে শব্দ। অনেক না-বলা কথাই বলে দেয়। ছোট্ট একটা উক্তি, নিঃসঙ্গতায় মন ভরিয়ে দেয়। ছোট্ট একটা ভরসা, থমকে যাওয়া জীবনে নতুন স্পন্দন জাগায়।

নেচে উঠল মঞ্জরীর হৃদয়। সহায় বলতে তো বৃদ্ধা মা। বাবা সরকারি ডাক্তার। বছর তিনেক আগে মারা গেছেন। মা থাকেন যাদবপুরের একটা ফ্ল্যাটে। সে তো আর মায়ের ঘাড়ে গিয়ে চাপতে পারে না। কুড়ি বছর বিবাহিত জীবনের পর চাকরিজীবী মেয়ে তো আর মায়ের ঘরে ফেরত যেতে পারে না!

মঞ্জরী অরিজিতের চোখে কী যেন খুঁজছিল। আজও জানে না অরিজিৎ। যুগ-যুগান্তের ফেলে আসা প্রেম কী এভাবেই ঝড় তোলে? দুটি আত্মা কী এভাবেই চিনে নেয় একে-অপরকে? অনন্ত না-বলা প্রেম?

যার ভাষা নেই।

শব্দ নেই।

অভিব্যক্তি নেই।

কিছু মুহূর্ত ছাড়া।

ঢেউটা বুকে চেপে উদাসীনভাবে দেওয়ালের দিকে তাকাল অরিজিৎ। স্বপ্ন দেখতে চায় না। স্বপ্ন বড় বেদনাময়।

****

ডেভিডকে গঞ্জনা দিয়ে রঞ্জিতা বলল “হোয়াট কাইন্ড অফ ফাদার আর ইউ? হোয়েন ইউ ম্যারেড মি, ইউ প্রমিসড টু টেক ফুল কেয়ার অফ হার”

“জিতা, সি ইজ অ্যান অ্যাডাল্ট। হাউ ক্যান আই রেগুলেট হার লাইফ?” ডেভিড মিনমিন করে রঞ্জিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

“ইটজ নট এ কোয়েশ্চেন অফ রেগুলেটিং হার লাইফ। বাট হোয়াট ইজ রাইট ফর হার”

“সি ইজ ওল্ড এনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট” ডেভিড বোঝাবার চেষ্টা করল।

রঞ্জিতা ঝাঁঝিয়ে উঠল “ইফ সি ওয়াজ, দিস ম্যারেজ উডন্ট হ্যাভ ব্রোকেন। সি ইজ স্টিল এ কিড”

শ্রাবস্তি কিড কি না ডেভিড জানে না। পশ্চিমি সভ্যতায় বড় হয়ে ওঠা কোনও মেয়ে আঠারো বছরের পর কিড থাকে কি না, জানা নেই। ডেভিডের মনে হল, রঞ্জিতা পুবের চোখ দিয়ে পশ্চিমকে ধরার চেষ্টা করছে। নিজে পশ্চিমকে বরণ করলেও, মনটা পুবের গারদেই বন্দি। তার টানাপোড়েন মেয়েকে নিয়ে, কী করবে, না বুঝেই ডেভিডের ঘাড়ে দোষ দেওয়ার চেষ্টা।

এটাই রঞ্জিতার প্রবলেম।

কী জবাব দেবে? তার বিয়ে ভেঙে, এমিকে ঘর-ছাড়া করে, রঞ্জিতা যে পৃথিবী গড়েছে, সেখানে শ্রাবস্তি কনফিউশনে বড় হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। যদি এমি আর ডেভিডের বংশধর থাকত! তাহলে হয়ত এমিকে ছাড়ার আগে, ডেভিড আরও একবার ভাবত।

নির্লিপ্ত হয়েই বলল “ইচ অফ আস হ্যাভ টু গো থ্রু আওয়ার লাইফ”

“রাবিস। আই ওয়ান্টেড টু বি হিয়ার। সো আই অ্যাম হিয়ার” রঞ্জিতা মানতে নারাজ।

ডেভিডের মনে হল, রঞ্জিতা অযথা শ্রাবস্তিকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ছে। শ্রাবস্তি অ্যাডাল্ট। জীবনকে ঠিক গুছিয়ে নিতে পারবে। শ্রাবস্তির ইন্ডিয়া যাওয়ার চিন্তা রঞ্জিতাকে বিচলিত করছে না। ভয়, আশঙ্কা। যদি ন্যাচারেল বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়... তার আসল রূপ খুলে যাবে।

ডেভিড বলল “সি হ্যাজ দ্য রাইট টু ফাইন্ড দ্য ট্রুথ ইন হার ওন ওয়ে। ইটজ জাস্ট এ ম্যাটার অফ টাইম। টুডে ইজ দ্য ডে। হাউ ক্যান ইউ এলিয়েন হার ফ্রম হার ওন ওয়ে অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং?”

“দ্য রং ওয়ে” রঞ্জিতার কথায় শ্লেষ।

“দ্যাটস ইওর প্রবলেম। ইউ অ্যাডপ্ট দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়েজ অফ লাইফ। অ্যান্ড ইয়েট ওয়ান্ট ইওর ডটার টু গ্রো আপ লাইক দ্য ইস্টার্নস। টু ফলো ইউ হোয়াট ইউ প্রিচ” আস্তে বলল।

“ইটস বিটউইন মি অ্যান্ড মাই ডটার। ইউ ডোন্ট কাম ইন দ্য পিকচার। ইউ আর নট হার ফাদার। সিন্স হার ন্যাচারাল ফাদার ইজ আউট অফ দ্য সিন, দ্য ওনাস লায়েজ অন মি টু গাইড হার ইন দ্য রাইট পাথ” রঞ্জিতা থাপ্পড় মেরে ডেভিডকে বসিয়ে দিল। বিয়ে করেছ বলে সব অধিকার কিনে নাওনি।

ডেভিড বুঝতে পারে, ডাক্তার জেকিল আর মিস্টার হাইডের মতো দ্বন্দ্বে জর্জরিত রঞ্জিতা। দোদুল্যমান এই মানসিকতা নিয়েই সারা জীবন কাটিয়েছে। আগে বুঝলে এমিকে ছেড়ে কী রঞ্জিতাকে বিয়ে করত! বেঁচে গেছে ওর প্রাক্তন স্বামী অরিজিৎ বসু। এই নিদারুণ অসম্পূর্ণ নারীকে কী কেউ পূর্ণ করতে পারবে!

পূর্ণতা না খুঁজে, দৈনন্দিন গার্হস্থ জীবনে অশান্তি না বাড়িয়ে, নিঃশব্দে ডেভিড অন্য ঘরে চলে গেল। পয়েন্টলেস আরগুয়িং উইথ আ লেডি হু ফেইলস টু আন্ডারস্ট্যান্ড।

****

ছোটবেলার বুকভরা স্বপ্নটাকে অরিজিৎ রঞ্জিতার মধ্যে খুঁজেছিল। দূরের চাঁদটাকে ছোট্ট বাচ্চার মতো হাতে পেতে চায়।

আয় আয় চাঁদমামা

খোকার কেপালে টিপ দিয়ে যা

সিঁদুর পরিয়ে ছোটবেলার বিপুল বুকভরা স্বপ্নটাকে খুঁজেছিল রঞ্জিতার উত্তপ্ত দেহে। ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে, বিস্তীর্ণ সবুজে, নীল আকাশে ভাসা মেঘটাকে নরউড গ্রিনের ফ্ল্যাটে। রঞ্জিতার গোলাপি টপস ঢাকা বুকে। বেঁচে থাকার অভিলাষা। বহুদিনের স্বপ্ন আঁকা ভালোবাসা। নতুন জীবন পথে আবেগ তোলা নতুন ভাষা।

সোনালি আলোয় ডানামেলা এয়ার ইন্ডিয়ার ৭৮৭ বোয়িংটা রঞ্জিতার সঙ্গে সেই স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল। কেন যে মানুষ স্বপ্ন দেখে? না দেখলে দুঃখ পেতে হয় না। তবুও স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়। যেমন সব হারিয়েও, মনের নিথর পাথরকে অরিজিতের হাত ধরে মঞ্জরী বসন্তের কোকিলের গান শুনতে পায়। শীতের মধ্যেও বসন্তের সুর জানান দেয় বাইরের হাওয়া। মনে বসন্তের ডাক।

তখন কত স্বপ্ন। কত আবেগ। মিডল টেম্পেলের স্তম্ভ থেকে নরউড গ্রিনে। গাড়িতে ঘণ্টাখানেক হলেও, বড়ই কাছে। আত্মার কাছাকাছি। নিবিড় অনুভবে।

স্বপ্নটা কী জানার আগেই শীতের ভোরে কুয়াশার ঝলক লেক গার্ডেন্সের দোতলার বারান্দায়। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দাদু বলত "তখন সাহেবদের রাজ। বেণীমাধব দাসের সান্নিধ্যে বড় হয়ে উঠেছিলাম। কী করব বোঝার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম স্বাধীনতা আন্দোলনে"

ছোট্ট রঞ্জিতা স্কিপারে লাফিয়ে জিজ্ঞেস করত "পড়াশোনা করতে না?"

"সেরকমভাবে নয়। তবে পরীক্ষায় খারাপ করিনি। সুভাষ বোস ডাক দিলেন। কংগ্রেস পার্টিতে জয়েন করলাম। তখন একটাই স্বপ্ন। ব্রিটিশদের দেশ থেকে হঠাও"

"কেন দাদু, ব্রিটিশরা কী ক্ষতি করেছিল?"

"অত-শত জানতাম না। শুধু জানতাম, ডাল-ভাত স্বাধীন হয়ে খাব। পরের গোলাম হয়ে নয়" একটু থেমে, চশমাটা টেবলের ওপর রেখে বললেন "গান্ধীজি বলেছিলেন ওয়ে টু স্বরাজ ইজ স্টিপ অ্যান্ড ন্যারো। তার স্বপ্নে কতবার জেল খেটেছি"

ছোট্ট রঞ্জিতার মাথায় ঢুকত না ব্রিটিশ রাজত্ব করুক, চাই ভারতীয়, কী আসে যায়? লেক গার্ডেন্সের দোতলার বারান্দা দিয়ে পুরো আকাশটা দেখা যায় না। মায়ের বোনা গোলাপি সোয়েটার চাপিয়ে, ঠান্ডায় নিজেকে ঢেকে রাখা।

দাদু চোখ বন্ধ করে বলে চলেছে "চারণকবি মুকুন্দ দাশ তখন গাইছেন ছেড়ে দে রেশমি চুড়ি বঙ্গ নারী ... রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের পর নাইট উপাধি ছাড়লেন... বিনয়-বাদল-দিনেশের ফাঁসি..."

রঞ্জিতা স্কিপিং থামিয়ে বলল "তাতে তোমার কী এসে গেল?" আগামী প্রজন্ম ফেলে আসা বিশ্বাসকে প্রশ্ন করছে। দাদু বুঝলেও, ছোট্ট রঞ্জিতার বোঝার ক্ষমতা ছিল না, অজান্তে কত বড় প্রশ্ন করেছে।

আজও জীবনে অর্থহীন উন্মাদনা আছে বলেই পৃথিবীটা এগিয়ে চলেছে। যেদিন সেই পাগলামোর পোকা, উচ্ছ্বাসের আবেগ হারিয়ে যাবে, হিসেব নিয়ে বসে, মানুষ সব কিছু চাওয়া-পাওয়ার মাপকাঠিতে বিচার করবে, সেদিনও কী নতুন কিছু সৃষ্টি হবে? বিপ্লব, কবিতা থেকে বিজ্ঞান। সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন, যেদিন কারও মাথায়, পাগলামির ভূত চেপেছিল।

দাদুও ওই পাগলের দলের শরিক। ব্রিটিশ গোলামির প্রতিবাদের নীরব সাক্ষী।

রঞ্জিতার কথা টেনে দাদু বলেছিল "আজ বুঝবি না। একদিন টের পাবি"

ঠিকই বুঝেছিল রঞ্জিতা, নিজের মতো করে। ব্রিটিশ এমন এক জাতি, দুনিয়াকে পায়ের তলায় লুটিয়ে রাখতে পারে। সভ্যতাকে আগামীর রশ্মি দেখাতে পারে। ধ্বজা উড়িয়ে, পৃথিবীর বুকে, নিজেদের দৃঢ় পদক্ষেপ রাখতে পারে।

বড্ড ছোট মনে হয়েছিল নিজেকে, এই সর্বগ্রাসী সভ্যতার কাছে।

মা বলত "এদেশে কিসসু হবে না"

বড় হতেই মাকে প্রশ্ন "কেন মা?"

“দেখ না, আমি বাংলা সাহিত্যে ডক্টরেট। ডিলিট। কী হল? হাতা-খুন্তি ঠেলছি”
“বিলেতে থাকলে কী অন্য কিছু হত?”
“কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যেতাম”
একটা স্বপ্ন। দাদুর মতো সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়। তাতে গুলি খেয়ে শহিদ হওয়া যায়। নিজের লাভ হয় না। লাভ করতে হলে, ও দেশের মাটিতে বসেই ওদের জয় করতে হবে। দাদুরা সেকেলে। ওদের চিন্তাধারাও। অতীতের দিকে না তাকিয়ে, আগামীর সাজে সাজতে হবে। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। স্বপ্নের মায়াবি আলোকে। একটা রঙিন কালো পর্দার আড়ালে।
রঞ্জিতার ছোটবেলার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিল অরিজিৎ। মায়ের মুখে শোনা, ছোটবেলার রূপকথার দেশের কবিতাকে বাস্তবের আঙিনায় পৌঁছে দিয়েছিল। পিকাডেলি সার্কাসের আলোর বাহারে। রূপে, রসে, ছন্দে। সোহোর রেমন্ড রিভারবেয়ার থেকে ওয়েস্টমিনস্টারের নৌকায় আরেক পৃথিবীতে।
এটাই জীবন। বেঁচে থাকার শহর।

****

আহা রে! মেয়েটার মুখের ওপর রোদের আভাটা ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে। চাদরটা গা থেকে সরে গেছে। মুখটা থমথমে। বোধহয় কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছে। কাল রাতে পর্দা টেনে শুতে ভুলে গেছে। এখন সকাল নটা হলেও গ্রিনউইচ মিন টাইমে এখনও সাড়ে-চারটে। অরিজিৎ চারদরটা টেনে দিল শ্রাবস্তির ওপর। পর্দা খুলে দিল। শান্তিতে ঘুমোক। আজ শনিবার। ওদের উইকএন্ড।

শীতের সকালের মিঠে রোদ উপেক্ষা করে জানলার ধারের আরাম কেদারায় বসল। আজ সে সকালের সূর্য দেখবে না। শুধু বুক ভরে চেয়ে থাকবে তার একমাত্র উত্তরসূরির দিকে। মনটা ভরে গেছে পরিপূর্ণতায়। কেন? শুধু কী এত বছর পরে মেয়েকে দেখায়? যাকে বিগত সতেরো বছর দেখেনি। মনে হল, সে স্বার্থপরের মতো নিজের কথা ভেবেই আট বছরের শ্রাবস্তিকে ছেড়ে এসেছিল। শুধুই স্বার্থ? তখন কী মেয়ের থেকে প্রফেশনাল সাকসেসই প্রধান ছিল?

একটু নড়ে আবার উল্টো দিক ফিরে শুল শ্রাবস্তি। ঘুমোক। মুখ দেখা যাচ্ছে না। চুলগুলো বালিশে ছড়িয়ে। কত বড় হয়ে গেছে। মনে পড়ল সেসব রাতের কথা। যখন ওকে নিয়ে সারা রাত বসে থাকত। ঘরের কাজের ক্লান্তি, পড়াশোনার পর রঞ্জিতা গভীর ঘুমে মগ্ন। মাঝরাতে ওর ডিম্যান্ডসের তদারকি। পাশে না থাকলে মেয়েটার চিৎকার।

রঞ্জিতাকে বলেছিল "পাশের ঘরে শুলে ঘুমোতে পারবে। উইকএন্ডে আমি ওকে সামলাব"

সেই শ্রাবস্তি।

লন্ডনের ইলিং হসপিট্যালে জন্মাবার পর গাড়ি নিয়ে ছুটে গেছিল হাউন্সলোর মাদার কেয়ারে প্রথম জামা কিনতে। রঞ্জিতার সুপারস্টিশন ছিল, জন্মাবার আগে জামাকাপড় করালে, বাচ্চার অমঙ্গল হয়। মেয়ে মানে গোলাপি। ছেলে হলে নীল। মেয়ে যখন, গোলাপি জামা, সোয়েটার, র‍্যাপার। বুকের দুধ খাওয়ালে স্তন ঝুলে যাবে। কে যে রঞ্জিতাকে শিখিয়েছিল? পাউডার মিল্ক গরম জলে গুলে, কোলে করে ফিডিং বটল নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসা। সময়-অসময় হাগিস চেঞ্জ।

রঞ্জিতা বলেছিল "বাচ্চার যখন এত শখ, তুমিই সামলাও"

রঞ্জিতার কী প্রেগনেন্সিতে সমর্থন ছিল না? থাক, চাই না থাক, ইটজ টু লেট।

শ্রাবস্তি আড়মোড়া ভেঙে হাত দুটো শূন্যে ছুড়ে চোখ কচলিয়ে বলল "হোয়ার অ্যাম আই?"

"ক্যালকাটা। চা করে আনি"

টেবল থেকে চশমা তুলে অরিজিৎ বেরিয়ে গেল। বাড়িতে কী কাজের লোকের অভাব? তবুও কেন যে অরিজিৎ নিজেই চা করতে গেল, কে জানে? একদিন ছোটবেলায় মেয়েকে কোলে নিয়ে দুধ খাইয়েছে। আজ মেয়ে সাবালক। মেয়েকে চা খাওয়ানোর লোভটা সংবরণ করতে পারল না।

এই ছোট অভিব্যক্তির মধ্যে যে কত পাওয়া লুকিয়ে, সবাই যদি বুঝত? বুঝলে, বড় পাওয়ার পেছনে না ছুটে, ছোটগুলো হারাত না।

ওর বেরনোর দিকে তাকিয়ে হাত দুটো টান করে, আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল শ্রাবস্তি। পর্দাটা ফাঁক করে, মধ্য ভোরের কলকাতাকে দেখল। সল্ট লেককে, ঠিক কলকাতা বললে ভুল হবে। কলকাতার চেয়ে অনেক শান্ত, নিরিবিলি। এখানে নরউড গ্রিন, হ্যাম্পটন কোর্ট বা গ্রিনউইচ ভিলেজের ছোঁয়া। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে পর্দাটা টেনে দিল।

মায়ের অমতে, সবকিছু পেছনে ফেলে কেন এই অজানার পথে? কেবল স্টিভের ধাক্কার পর? বাবা তো আগেও ছিল। কোনওদিনও তো বাবার কথা সেরকমভাবে মনে হয়নি। আজ কেন?

দু-কাপ চা হাতে ঘরে ঢুকল অরিজিৎ। শ্রাবস্তির দিকে এগিয়ে বলল "ঘুম হল?"

"ইয়েস ড্যাড। থ্যংকস" চায়ের কাপটা নিল।

অরিজিৎ বুঝতে পারছিল এরপর কী আসবে। নিস্পৃহভাবে কাপটা নিয়ে পাশের সোফায় বসে বলল "ইজ এভরিথিং ফাইন?"

"পারফেক্ট। ড্যু ইউ অলওয়েজ মেক টি ইওরসেলফ?"

"নো। টুডে ইজ স্পেশাল। তুমি এসেছ"

অনেক অনুভূতি এই শব্দে বন্দি। অনেক কথা, অনেক সুর, অনেক রাগ। দুটি আত্মাকে নীরবে বন্দি করেছে। অনেক কথা বাকি থেকে গেছে। থাক। অনেক না বলা সুর উঁকিঝুঁকি মারছে। থাক। চায়ের পেয়ালার নির্বাক চুমুক অনুভূতির স্পন্দনকে অলিখিত মায়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে। এই নির্বাক স্পন্দন, অলিখিত মায়াই কী না বলা-কথা বলে দেয়? না-শোনা সুর নতুন করে শোনায়?

বাইরের সোনালি আলোয় ভেসে বেড়ানো পাখিদের দিকে তাকিয়ে একটা আবছায়া স্মৃতি আবার ফিরে এল। ধোঁয়াশায় ভরা আবছায়া অবয়ব। বাবার হাত ধরে ব্রাইটন বিচে গ্রীষ্মের এক দুপুরে এমনিভাবে তাকিয়ে ছিল, আকাশে ওড়া পাখিদের দিকে। নাম না জানা পাখি। ওরা বলত মাইগ্রেটরি বার্ডস। সেও কী ওদের মতোই মাইগ্রেটারি? প্রশ্নটা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সি ইজ ব্রিটিশ বাই বার্থ। বর্ন ইন ইংল্যান্ড। ব্রিটিশ বাই ন্যাশনালিটি।

অরিজিতের দিকে ফিরে বলল "আই ক্যান ভেগলি রিকল। হোয়েন ইউ, মি অ্যান্ড মাম মি ইউসড টু গো আউট এভরি উইকএন্ড"

চায়ে চুমুক দিয়ে অরিজিৎ বলল "ক্যান ইউ?"

"সিইং দোস বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য এয়ার, ইট রিমাইন্ডেড মি অফ দোস ডেইস"

অরিজিৎ উত্তর দিল না। শুনতে চায়। এখনও বলার সময় হয়নি। অনেক কথা বলা হবে। অনেক ব্যথা শোনা হবে। এখন নয়। এখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো শ্রাবস্তিকে ভেসে বেড়াতে দিতে হবে কলকাতার আকাশে-বাতাসে। চেনাতে হবে নিজের মাটির গন্ধ, সুদূর তেপান্তর থেকে আসা বলাকার মন।

বাবাকে চুপ থাকতে দেখে বলল "ড্যু ইউ রিমেম্বার?"

"অফ কোর্স। এভরি বিট অফ ইট। হাউ ক্যান আই ফরগেট?" এঙ্গেলবার্টের সুর ইজ ইট সো ইজি টু ফরগেট?

না। এখন কিছুই বলবে না। শুধুই শুনবে। শ্রাবস্তির কথা।

****

মঞ্জরী বলল "কথা হয়েছে?"

ফোনের ওপারে অরিজিৎ "না"

শ্রাবস্তি আসার পর মঞ্জরীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। উপস্থিতিটা শ্রাবস্তি কীভাবে নেবে, এই ভেবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে মঞ্জরী। হারানোর দুঃখ ভালো করেই বোঝে। অরিজিতের এই পাওয়াকে কোনওভাবেই হারাতে দিতে চায় না। অরিজিতের কাছ থেকে দূরে থাকলে শ্রাবস্তিকে আরও কাছে পেতে পারে অরিজিৎ।

"তুমি কথা তুলবে না?"

"না। ও দেখতে এসেছে, দেখুক। বুঝতে এসেছে, নিজের মতো করে বুঝে নিক। আমি কিছু বলতে গেলে মনে করবে, সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করছি"

"ও এখন কোথায়?"

"ওপরে। জানি না কী করছে। উইকএন্ড। বোধহয় রিল্যাক্স করছে"

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল অরিজিৎ। সংযত করে বলল "রাখি"

এতদিনে অরিজিৎকে কিছুটা চিনতে পারে মঞ্জরী। অরিজিৎ যখন ঝট করে কথা থামিয়ে দেয়, তখন অন্য পৃথিবীতে চলে গেছে। ধূসর পৃথিবীর নিস্তব্ধ বালুচরে, ভাসমান আবছায়া আলোকে সন্ধ্যারাগের নতুন সুর

খুঁজতে। সেখানে স্তব্ধ নীরবতায় না-শোনা রাগ। কী রাগ, কে জানে?

সল্ট লেকের নিস্তব্ধ শনিবারের শীতের কুয়াশায় কয়েকটা বিন্দু ভেসে বেড়াচ্ছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পুরিয়া ধানেশ্রীর সুরে। তাই দিয়ে আবার নতুন করে সাজাতে হবে সায়াহ্নের সন্ধ্যারতি।

কতবার?

মঞ্জরীর সঙ্গে আলাপে সে পেয়ে গেছিল হারানো ছন্দের গতি। বিলুপ্তির অন্ধকার থেকে মনের পরিতৃপ্তি। চলার নতুন জ্যোতি। দুঃখটা যখন ধূসর পাণ্ডুলিপির মতো ক্রমশ মনের গভীরে হারিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মঞ্জরী একদিন দুম করে বলে বসল "ভালো লাগছে না"

ওর কথার ঝংকার টেনে অরিজিৎও বলেছিল "আমারও। চলো না কোথাও ঘুরে আসি"

দু'জনেই পালাতে চাইছিল তাসের দেশ ছেড়ে। অলীক স্বপ্নের মায়ালোকে। মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এক শুক্রবার অরিজিতের ফোন "আধঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে নাও"

"কেন?"

"গাড়ি নিয়ে আসছি। কয়েকদিন কলকাতার বাইরে ঘুরে আসি"

"কোথায়?"

"জানি না। আধঘণ্টার মধ্যে আসছি" ফোনটা কেটে দিয়েছিল অরিজিৎ।

এই অরিজিৎ। এমনিতে ছকে বাঁধা জীবন। কিন্তু মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা হলেই শীতে বসন্তের কোকিলের ডাক শুনতে পায়। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। কিংবা এলোমেলো করে দেওয়ার মধ্যে নিজেকে পায়। মঞ্জরী অনুভব করতে পারে।

অরিজিতের পাশে সামনের সিটে, হাল্কা নীল তাঁতের শাড়িতে, সিট-বেল্ট লাগিয়ে বলল "জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। কেন জান? নিজেই জান না। চল, যেখানে নিয়ে যাবে। সঙ্গে আছি"

শীতের সকালের মিষ্টি রোদ্দুর গায়ে মেখে চশমার ফ্রেম ঠিক করে, গাড়ির স্টিরিও সিস্টেমটা চালিয়ে দিল। কলকাতার ছেড়ে গাড়ি ছুটছে অজানার পথে। স্টিরিওতে বাজছে -

পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি

সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি

মঞ্জরী প্রশস্ত হাইওয়ের দিকে তাকিয়ে। জানা পথের চৌহিদ্দি ছেড়ে অজানার পথে। জীবন ভাটায় একটু ছন্দ, একটু আশা। পাখির মতো ডানা মেলে ধরে নিজেকে নতুন করে ভালোবাসা। নিজের মনেই বলল "ভালোই করলে। আমার মনও চাইছিল"

অরিজিৎ কোনও জবাব দিল না। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে গাড়ি ছুটছে। চেনা বদ্ধতা থেকে মুক্তির আনন্দের শূন্যতায়। না কী পূর্ণতা? শূন্য-পূর্ণের দোটানায় জীবনের গতি, প্রস্তুতি, দ্যুতি। ছোটার একঘেয়েমি থেকে নিষ্কৃতি। শুধু জানে, যখন মানুষের খিদে পায় সেটা প্রকৃতি। যখন মানুষ কেড়ে খায় সেটা বিকৃতি। যখন মানুষ ভাগ করে খায় সেটাই সংস্কৃতি। মঞ্জরীর সঙ্গে মুহূর্তটাকে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে একটা সৃজন লুকিয়ে। এটাই নতুন ছন্দের সুর এঁকে দেয়। পুরিয়া ধানেশ্রী থেকে শিবরঞ্জনী। রাগ নয়, ভেতরের সুখের প্রস্ফুটন। এক মুঠো সুখকে ভাগ করে নিতে আজ মঞ্জরীর সঙ্গে। দুঃখের কালবেলায় এটুকুই পাওয়া। হারানো সুরে, নতুন গান গাওয়া। এটুকুই মধ্য বয়সের চাওয়া।

এর আগে তো, এভাবে কখনও মঞ্জরীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েনি। কোনও রেস্তরাঁ বা গাছের আলো-আঁধারি। বা দু'জনের নির্জন আস্তানা। কিছু মুহূর্ত, কিছু টুকরো আবেগ। কিছু কথা। কিছু ভাষাহীন নীরবতার রেশ।

গলসি পর্যন্ত কোনও কথা নেই। সব কথা সুরের ছন্দে হারিয়ে। একটু এগিয়ে রাস্তার পাশের ধাবায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল "চা খাবে?"

"নিশ্চয়ই" সিট-বেল্ট আলগা করে গাড়ির দরজা খুলে মঞ্জরী পা ছড়িয়ে দিল ভিজে ঘাসের ওপর। "যাচ্ছিটা কোথায়?"

“চল না, যদ্দুর যাওয়া যায়। এখনও ঠিক করিনি। শান্তিনিকেতন, বিষ্ণুপুর, বেলিয়াতোড় বা মাইথন। যেখানেই হোক না কেন, এক সঙ্গে যাওয়ার আনন্দটাই বড়। ভালো লাগাটাই আসল” মুহূর্তের ছন্দকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার মধ্যেই তৃপ্তির প্রকাশ। একঘেঁয়ে স্তব্ধতার মৌন বিকাশ।

মনে পড়ে গেল সেই সময়কার কথা। যখন ভাশুর প্রায় তাকে গৃহছাড়া করে।

অরিজিৎ বলেছিল “কোর্ট কাছারি করে লাভ নেই। বছরের পর বছর কেস চলবে। ইনজাংশন হলে সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত কেউই বাড়ি ভোগ করতে পারবে না”

“তাহলে?”

“ভাশুরের সঙ্গে কথা বলি” অরিজিৎ স্বাভাবিক।

মঞ্জরী আশ্চর্য হয়ে গেছিল। কোনও ব্যারিস্টার যে ক্লায়েন্টের বাড়ি বয়ে বিপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে আসতে পারে, জানা ছিল না। স্বাভাবিক নয়। সেই মুহূর্তেই নতুন ছন্দ জলতরঙ্গ বাজিয়ে গেছিল। মিঠে সুখের অনুভূতি। অনেক হারানোর মধ্যে পাওয়ার আভাসে তৃপ্তি।

মঞ্জরীর বাড়িতে, ভাশুরকে বলেছিল “কোর্ট-কাছারি, মামলা-মোকদ্দমা করে কী হবে?”

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অরিজিতের ওপর “এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?”

“এসব করে লাভ নেই। ইনজাংশন দিলে, চোদ্দ বছর এ বাড়ি কেউই ভোগ করতে পারবে না। আপনার তো বাড়ি আছে। এই বাড়িটা নিয়ে কেন পড়েছেন?”

“এমনি কেন? কেউ ছাড়ে? বাড়িটার ভ্যালুয়েশন করাই। তার অর্ধেক ভাগ যদি মঞ্জরী আপনাকে দেয়?”

অরবিন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরিজিৎকে দেখেছিল। আমেরিকায় বসবাসকারি বাঙালি। নিজের সুবিধা বুঝে নিতে হবে।

অরিজিৎ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলেছিল “দলিলটা দেখেছি। কোনও মিউটেশন হয়নি। সেদিক দিয়ে এখনও বাড়িটা আপনাদের বাবার। দু’জনেরই সমান অংশ। আপনি তো আর এখানে থাকছেন না। কোর্ট-কাছারি করার চেয়ে আধা ভাগ অনেক ভালো। নয় কী?”

অরবিন্দ ভাবল। মঞ্জরীকে যতটা অসহায় ভেবেছিল, এখন মনে হচ্ছে ততটা নয়। এই ভদ্রলোককে যেখান থেকেই জোগাড় করে থাকুক না কেন, পেছনে বড় খুঁটি। নাম-ডাক-প্রতিপত্তি আছে, খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছে। এ যদি মঞ্জরীর হয়ে দাঁড়ায়, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গচ্চা ছাড়া আর কিছুই হবে না। তার থেকে টাকা নিয়ে সরে পড়াই ভালো। কোথা থেকে এই মহিলা এমন জাঁদরেল লোককে পাকড়াল, বুঝতে পারল না।

“দু-দিন ভাবার সময় দিন”

শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেছিল অ্যামেরিকাবাসী। কীভাবে যে মঞ্জরীর অ্যাকাউন্টস, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে অরিজিৎ জড়িয়ে পড়ল, নিজেও জানে না। একটা আশ্রয়, একটা বিশ্বাস খুঁজছিল মঞ্জরী। অরিজিতের ওপর নিজেকে সঁপে দিতে দ্বিধা করেনি।

হারিয়ে যাওয়া জীবনে নতুন নীড়। মনের কোণে বাজা জলতরঙ্গের শব্দহীন সমীর। অলিখিত মোহনায় দূর থেকে দেখা তীর। হারলে হারবে। সবই তো হারিয়েছে। আরেকবার নয় হারল। ক্ষতি কী?

অরিজিৎ চায়ের ভাঁড়টা মঞ্জরীর হাতে এগিয়ে দিয়ে বলল “চা খাও। চিকেন পকোড়া আসছে”

****

শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়ার ঝলক হঠাৎ ছুঁয়ে গেল শ্রাবস্তিকে। শীতের স্পর্শ। শ্রাবস্তি হাত কাটা সোয়েটারের বোতাম আটকে নিল। বারান্দা দিয়ে খোলা টেরেস। ওপারে কয়েকটা বড় গাছ। ইংল্যান্ডে দেখেনি। তারার আলোয় গাছগুলো আকাশের গায়ে বিচিত্র সিল্যুয়েট এঁকেছে। ছোটবেলায় রূপকথায় পড়া নোম বা গবলিনের মতো। আকাশ তারায় ভরা। ইংল্যান্ডের তারাগুলো এত ঝকঝকে নয়। ভেসে আসছে পোকার অদ্ভুত একঘেয়ে সুর।

মনে পড়ল ডেভিড ওকে পোলস্টার চিনিয়েছিল। বাংলায় ধ্রুবতারা। ধ্রুব মানে শিহর। স্ট্যাটিক। খুব কান্না পেল। স্ট্যাটিক। জীবনে স্ট্যাটিক বলে কিছু আছে নাকি। বারান্দার বেতের সোফায় গা এলিয়ে ইন্ডিয়ার হালকা শীতের আকাশে ধ্রুবতারা খুঁজতে লাগল। ধ্রুবতারা থেকে ল্যাম্প পোস্টের আলো। বাতির মতো জ্বলছে। দূরে অথবা কাছে। মিঠে কুয়াশায় ল্যাম্প পোস্টের আলোটা ফোটনের স্নিগ্ধতার বিন্দু ছড়িয়ে দিচ্ছে। নিঃঝুম নিস্তব্ধ বিশাল উপনগরী। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে ক্লান্ত রাগিণীর শেষ সুর বাজিয়ে যাচ্ছে। সময় হয়েছে অশ্বমেধের ঘোড়া থামানোর। যজ্ঞের আগুনে স্নাত হয়ে বিশুদ্ধতা চেনার। অস্তিত্বের পবিত্রতার ধ্রুবতারা দেখার।

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার

হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর

কয়েকফোঁটা শিশিরে হিমেল হাওয়ার স্পর্শ। শিহরণ। কম্পন। বাইরের নিস্তেজ আবরণ। নতুনের পথে দোটানার জাগরণ। অনেক প্রশ্ন তোলপাড় করছে। অস্তিত্বটা নিজের কাছেই ধোঁয়াশা। তার জন্য কী বাবার কিছুই করার ছিল না? একরাশ প্রশ্ন নিয়ে সাত-সমুদ্র-তেরো নদী পেরিয়ে সে এসেছে। হাত-কাটা নীল সোয়েটারের ওপর ডান হাত বোলাল। হৃদয়ের স্পন্দন কড়া নাড়ছে। কেউ কী নেই? তবে কী সব মিথ্যে?

স্টিভকে ধরে বাঁচতে গিয়ে অনুভব করেছিল, মায়ের শেখানো পৃথিবীর শূন্যতা। অনুভব করা সত্ত্বেও, অন্ধকারে হাত বুলিয়ে কী যেন খোঁজার চেষ্টা করে চলেছে।

"ইউ আর নট ইন্ডিয়ান। দেয়ার ইজ নাথিং ইন্ডিয়ান অ্যাবাউট ইউ। এক্সেপ্ট দ্য কালার অফ ইওর স্কিন" কথাটা কষে থাপ্পড় মেরেছিল তার ভারতীয় অরিজিনকে। কোথায় তার ভারতীয় বাবা, যে তাকে হাত ধরে পথ দেখাতে পারবে? মধ্যরাতে বাবার দুধ খাওয়ানোর স্মৃতি ধূসর। বাবা নেই। আছে মায়ের দ্বিতীয় পক্ষের আশ্রয় ডেভিড। ডেভিডের সে ক্ষমতা নেই। কার হাত ধরে ডার্কনেস ছেড়ে লাইট দেখবে? স্টিভের ব্রিটিশ অ্যারোগ্যান্স? না তার আইডেন্টিটির গরমিল? বাবা থাকলে কী বলত? জানার সৌভাগ্য হয়নি শ্রাবস্তির।

শ্রাবস্তির দিকে না তাকিয়ে অরিজিৎ বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়াল। কাশ্মীরি চাদরটা কাঁধের ওপর ফেলে উল্টোদিকের ল্যাম্প পোস্টে চেয়ে। ঝিঁঝি পোকার কলরব গেয়ে উঠছে ফেলে আসা অতীত।

খুকু ঘুমোল পাড়া জুড়ল বর্গি এল দেশে

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে

উইকএন্ডে ছোট্ট শ্রাবস্তির সঙ্গে বিনিদ্র নিশি। ফিডিং বটল, ন্যাপি। কিছুক্ষণের জন্য ক্লান্তির অবসান। ওপাশের খাটে গভীর ঘুমে রঞ্জিতা। মেয়ের কান্না তার রাতের সুখ-নিদ্রা ভাঙতে পারেনি। সেই রঞ্জিতা দোদুল্যমান জীবনবোধে অতীত। হারিয়ে গেছে দুঃখ-আনন্দের যুগলবন্দিতে।

"এখানে থাকব না" অরিজিতের দৃঢ়তায় কেঁপে উঠেছিল রঞ্জিতা।

"তোমার কেরিয়ারটাই বড়। আমরা কেউ নই?" রঞ্জিতার স্বরে স্বভাবজাত ব্যঙ্গ।

"কেরিয়ার নয়। মাথা উঁচু করে বাঁচা। ইন্ডিয়াতে গিয়েও সম্ভব। তোমার যেতে আপত্তি কোথায়?"

"আমার ইন্ডিয়া ভালো লাগে না। মেয়ে বড় হলে, এই বিদেশের মাটিতেই আবার ফিরে এসে লড়াই। আমরা কষ্ট করেছি। ও যাতে না পায়"

“ওর যেমন জীবন, আমাদেরও তো আছে”

চায়ের কাপগুলো ডিশ-ওয়াশারে ঢুকিয়ে রঞ্জিতা বলেছিল “বাবা হলে সব সেকেন্ডারি। মেয়ে প্রাইমারি”

রঞ্জিতা কী ঠিক বলেছিল? সংসার-ধর্মে ঢুকলে কী নিজের আমি'টাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হয়? এগো, না ওর জীবনদর্শন?

ধ্রুবতারার রং বারবার পাল্টায়! সেই রঙের বাহারে, জীবন নতুন স্পন্দনে সুরের মূর্ছনা ছড়ায়, আবেগ আর বিচারবুদ্ধির দ্বন্দ্বে। তার টানাপোড়েনেই জীবনের প্রবাহ। বা ফেলে আসা বিরহ। এই প্রবাহ-বিরহের দ্বন্দ্বদোলায় সন্ধ্যাতারার শেষ বাতিটা জানান দেয়, জীবনের উত্তরণ বা স্বপ্নের নতুন বাতাবরণ।

“ড্যাড, হোয়াই ডিড ইউ ডেসার্ট মি?”

শ্রাবস্তির কথায় চমকে উঠল অরিজিৎ। প্রশ্নটা আসবে, জানা। অতর্কিতে এভাবে আসবে, সেটা অজানা।

শ্রাবস্তির দিকে ফিরে বলল “টেক রেস্ট। পরে অনেক সময় আছে কথা বলার”

শ্রাবস্তি চেয়ার ছেড়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে বলল “হু অ্যাম আই? হোয়াট ইজ মাই আইডেন্টিটি?”

অরিজিৎ ফিরে বলল “কিছু খাবে?”

বাবার তাচ্ছিল্যে শ্রাবস্তি খেপে উঠল। এতদূর থেকে কি এসেছে শুধু বাবার কাছে আতিথেয়তার জন্য?

“কাম অন ড্যাড। ইউ আর ট্রাইং টু অ্যাভয়েড দ্য কোয়েশ্চেন” চোখে-মুখে প্রচ্ছন্ন বিরক্তি।

অস্তিত্বহীন জীবনে বাবা আরও বেশি করে তাকে মুছে দিতে চাইছে। হি হ্যাজ ডেসার্টেড হার। লেফট হার টু এ মিক্সড এনভায়রনমেন্ট। হোয়ার হার ম্যারেজ, হার লাইফ ইস অ্যাট স্টেক। লাইফ হ্যাজ বিকাম মিনিংলেস, ইন দ্য অর্কেস্ট্রা অফ হার টার্মঅয়েল। মা ঠিকই বলেছিল। বাবা ভীষণ স্বার্থপর। অ্যান আউটরাইট সেলফ-সেন্টার্ড হিউম্যান বিইং। বউ-বাচ্চার জন্য ভাবে না। এ ডিগ্রেডেশন অফ এ হিউম্যান বিইং। সে বোকার মতো এতদূর এসেছে তার মানে খুঁজতে? হাউ ফুলিশ অফ হার!

অজান্তেই বেরিয়ে এল “আই হ্যাড নো আইডিয়া। ইউ আর সো সেলফ সেন্টার্ড”

অরিজিৎ রেলিং ছেড়ে বেতের সোফায় বসল। শ্রাবস্তিকে অন্য সোফায় ইঙ্গিত করে, ঠান্ডা স্বরে বলল “সিট ডাউন”

শ্রাবস্তির রাগ তখনও কমেনি। বুকের ভেতরটা ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে বিদীর্ণ। প্রবল আবেগে চোখের জল আছড়ে পড়তে চাইছে, অন্তরের পুঞ্জীভূত বর্ষার খরস্রোতা প্লাবনে। বাহির-অন্তর মিলেমিশে একাকার আদি অকৃত্রিম শাশ্বত প্রশ্নের নিষ্পেষণে। কালস্রোতে বিভিন্ন আচ্ছাদনে সাজানো, আমোঘ তরঙ্গের নিত্য-নতুন জোয়ারে জীবনব্যাপী ধ্রুপদি কলতানে। হু অ্যাম আই? হোয়াট ইজ মাই আইডেন্টিটি?

রেলিংয়ে ভর দিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল “আই ওয়ান্ট অ্যান আন্সার”

অরিজিৎ স্থিরভাবে তাকাল বহুদিনের ফেলে আসা একমাত্র লিগ্যাসির দিকে। তার প্রতিটা রক্তবিন্দু, প্রতিটা কোষের জিন, তার উত্তরাধিকারের ভবিষ্যৎ, বেঁচে থাকা বর্তমানকে প্রশ্ন করছে। আমার মধ্যেই তুমি বেঁচে থাকবে। আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তোমার ভবিষ্যৎ নেই। আমার মধ্যেই তোমার প্রকাশ। আমার মধ্যেই তোমার বিকাশ। আমার অবলুপ্তিতে তোমার অস্তিত্বের সর্বনাশ।

আবেগে থরথর করে শ্রাবস্তি কাঁপছে। ভবিষ্যৎ নিশ্চিহ্ন করে দেবে তাকে অবলুপ্তির অন্ধকারে।

ধীর শান্ত গলায়, ভবিষ্যতের চোখে চোখ রেখে অরিজিৎ বলল “তোমায় জবাব দেব না। দেখাব”

****

আহা রে! মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। পোরশে চড়া মেয়ে, লোকাল ট্রেনের ভিড়ের ধকল কী নিতে পারে? নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, অরিজিৎ সরে যাওয়া খেশটা গায়ে ঢেকে দিল। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে একটাই জিজ্ঞাসা 'আই হ্যাভ হেলপড হার টু টেক হার ফার্স্ট স্টেপ ইন লাইফ। উইল সি হেল্প মি টু টেক মাই লাস্ট?'

অনেক প্রশ্ন, অনেক দ্বন্দ্ব ঘুরপাক খাচ্ছে। সে কী স্বার্থপরের মতো মেয়েকে ছেড়ে এসেছিল! শ্রাবস্তি তো তাই বলল। রঞ্জিতাও বহুবার বলেছে। ধ্রুবতারার রং পাল্টায়। তখনকার ধ্রুবতারা আর এখনকার সন্ধ্যাতারার মধ্যে কী কোনও তফাত আছে? তখন কী ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বলে এগোটাই বড় ছিল? পরিবার কী তবে সন্ধ্যাতারার মতোই গৌণ?

রঞ্জিতা বলেছিল "ইউ কেয়ার ফিগস ফর এনি অফ আস। ইউ আর আফটার ইওর প্রফেশনাল সাকসেস। দ্যাটস দ্য বি অল অ্যান্ড অল অফ ইওর লাইফ"

ব্রিটেন থেকে আসা মেয়েকে ভারত দেখানো শুরু। চার্চে সান্ডে মর্নিং কয়ার শুনে বড় হয়েছে। ক্যান্টারবেরি ক্যাথিড্রালের কথা মনে পড়তে পারে। আজ রবিবার। সেই কয়ার-ই তাকে শোনাবে। না, না, ক্যান্টারবেরি ক্যাথিড্রালে নয়। কলকাতার পাশেই ব্যান্ডেল চার্চে। গাড়ি ছেড়ে হাওড়া স্টেশন থেকে দু'জনে ব্যান্ডেল লোকালে। গা-ঠেলা ভিড়। শীত বলে অতটা গরম লাগছে না। কেউ লজেন্স বিক্রি করছে, কেউ ধূপকাঠি। অপূর্ব সুবাস।

শ্রাবস্তি জিজ্ঞেস করল "হোয়াট ফ্র্যাগনেন্স ইজ দিস?"

অরিজিৎ হেসে বলল "তোমাদের ল্যাভেন্ডার নয়। পিওরলি ইন্ডিয়ান। স্যান্ডেল উড। এই চন্দন কাঠ আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে জুড়ে আছে। বিয়ে থেকে শ্রাদ্ধ। সবেতেই ব্যাবহার করা হয়"

"দ্য স্মেল ইজ এক্সুইজিট। ক্যান আই বাই ওয়ান?"

"নিশ্চয়ই। অ্যাজ মেনি অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট"

কয়েক প্যাকেট ধূপকাঠি কিনে ফেলল। ফেরিওয়ালা ভাবেওনি এক সঙ্গে কেউ এতগুলো কিনবে। দামের বেশি টাকা গুঁজে দিল ওর হাতে। মেয়ে চেয়েছে। সেটাই বড় কথা।

ট্রেন শ্রীরামপুর-ভদ্রেশ্বর পার হয়ে গেছে। শ্রীরামপুর থেকে ফেরিওয়ালা পুঁতির মালা নিয়ে উঠল "খুব সস্তা। জুড়ি পাওয়া মুশকিল। মাত্র দশ টাকা" পসরা মার্কেটিং করছে।

"সো চিপ। দিস চাঙ্কি জুয়েলারিস কস্ট এ ফরচুন ইন হ্যারডস" চোখে বিস্ময়।

"এটা তোমার ইউকে নয়, ইন্ডিয়া। এখানের লোকেদের অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই"

গরিব দেশে এসব জিনিস কত সস্তা। অথচ শ্রাবস্তি দেখেছে লন্ডনের ডিজাইনার ব্যুটিকে চড়া দামে এগুলো বিক্রি হয়। ব্রিটিশরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেগুলো ম্যাচিং ড্রেসের সঙ্গে কিনতে।

"হোয়াট প্রফিট ড্যু দে হ্যাভ?"

"নট এ লট। এনাফ ফর এ সার্ভাইভাল। ঠিক ততটাই। হাম্বল সার্ভাইভালের জন্য অনেক টাকার দরকার হয় না। পুরোটাই মনের ব্যাপার। কত চাই? কতটা পেলে বলতে পারবে, আর চাই না"

"ইন আওয়ার ওয়ার্ল্ড এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু দ্যাট" শ্রাবস্তি তার দেখা দুনিয়াটা বোঝাতে চাইছে।

"সো অলসো হিয়ার। কিন্তু সবার তো টাকা নেই। তাদেরও বাঁচতে হয়। ফাইন্যালি এভরিথিং বয়েলস টু হাউ মাচ উই নিড অ্যান্ড হাউ মাচ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ। পোরশে কিংবা মার্কের সঙ্গে তো সার্ভাইভালের কোনও সম্পর্ক নেই। ইটজ হাউ মাচ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ টু মেক ইউ হ্যাপি"

মা শিখিয়েছিল স্ট্যাটাস, মানি, পাওয়ার। বাবা অন্য রকম বলছে। পৃথিবীর দুই প্রান্তে দু'জনের কথায় কোনটা ঠিক? হুইচ ইজ দ্য রাইট ওয়ে?

মেয়েকে ঘুমোতে দিয়ে অরিজিৎ নিজের ঘরে ফিরে এল। সাউন্ড সিস্টেম আপনমনে বেজে চলেছে। কোকিলের কুহু শুনতে পাচ্ছে। এত বছর পর মেয়ের সান্নিধ্যে? যার উপস্থিতি সমাজের কাছে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে? জিনের প্রোপাগেশন সাবকনশাস মাইন্ডে সিকিউরিটি দেয়। শ্রাবস্তি ফিরে এসেছে পদবির উৎসে। বসু - গৌতম গোত্র। মানে খ্রিস্টপূর্বে গৌতম মুনির বংশধর।

রামধনুর সাতটা রঙের মতো তিনটে রং ক্যালিওডোস্কোপের ছকে ঘোরাফেরা করছে। সেগুলো ধ্রুবতারাকে কী এক আভরণ পরাচ্ছে,। নতুন রূপে, ছন্দে। ধ্রুবতারা পাল্টায় কি না অরিজিৎ জানে না। হয়ত

নয়। জীবনের এই ক্যালিডোস্কোপে শুধু তার আভরণই পাল্টায়।

চমকে উঠেছিল শ্রাবস্তি। অন্ধ স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সাত বছরের দৃষ্টিসম্পন্ন মেয়েকে দেখে। বাবা-মায়ের হাত ধরে ট্রেনের সিটের মাঝখানের আয়েল দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্ধ বাবা-মায়ের গলায় সুরঃ

আমার দুখে দুখে জনম গেল গো

গুরু সুখ তো আমার সইল না

জনম দুখি কপালপোড়া গুরু

আমি একজনা

মেয়েটি হাত পেতে সবার কাছে ভিক্ষা নিচ্ছে। লেস্টার স্কোয়ার আন্ডারগ্রাউন্ডে গিটার নিয়ে বহুবার ব্রিটিশদের ভিক্ষে করতে দেখেছে। কিন্তু এই গানে তো ব্যথার সুর। ব্যথা কী লেস্টার স্কোয়ারে নেই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সুরের সঙ্গে মনের এত যোগাযোগ নেই। এই ইন্ডিয়া। এখানে সুর এভাবেই মনের কথা বলে! তার বিক্ষিপ্ত মন সেই সুর শুনতেই এসেছে। এই না-চেনা, না-জানা, উপ-মহাদেশে। অনেক প্রশ্ন নিয়ে এসেছিল জন্মদাতার কাছে। সব প্রশ্ন উহ্য রেখে প্রখ্যাত ব্যরিস্টার বাবা গাড়ি ছেড়ে শ্রাবস্তিকে নিয়ে লোকাল ট্রেনে। রিয়েল ইন্ডিয়াকে দেখাতে।

পাশের ধুতি-শার্ট পরা লোকটা অরিজিৎকে বলল "আপনাকে তো আগে দেখিনি। আপনি কী এই ট্রেনে প্রথম?"

"প্রথম নয়। তবে অনেকদিন পর"

যে যথা মাং প্রপদ্যমেত অংসতথৈব ভাজ্যাম্যহম।

মম বর্ত্মানুবর্তমেত মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।

লোকটি নিজের মনে আওড়ে গেল। ফিরে তাকাল ওর দিকে। অত্যন্ত সাদামাটা। অথচ কি অদ্ভুতভাবে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াচ্ছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত লোকটিকে মেপে বলল "আপনি দারুণ পণ্ডিত"

শ্রাবস্তি দেখছে লোকটিকে।

"আমি কোনও পণ্ডিত নই। বিদ্যে ক্লাস এইট"

"সংস্কৃত শিখলেন কোথায়?"

"শিখিনি বাবু। আমার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর বলিয়ে নেন"

গুল মারছে। এ কখনও হয়? শ্রাবস্তি অবাক হয়ে শুনছে। গডের সারমন চার্চে প্রিস্টদের মুখে শুনেছে। সেটাই রীতি। সেটাই প্রথা। অনেক দেবশিশু ধর্মের বড় বড় অরগ্যানাইজেশন আলোকিত করে হাজারো লোকের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী আওড়াচ্ছে। তাও ধর্মগ্রন্থ থেকে মুখস্থ বিদ্যে। আর এই লোকটা না পড়েই! গুল ছাড়া আর কী। অরিজিতের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছে, ওকে ওরা বিশ্বাস করছে না।

অরিজিৎ বলল "মানেটা আপনি জানেন?"

শ্রাবস্তির দিকে তাকাল। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে। এখানে কী সাধারণ লোকও সংস্কৃত শ্লোক জানে?

"কেন জানব না বাবু? যে যেভাবে আমাকে চায়, সে সেই ভাবে আমাকে পাবে। আমি তো ওনাকে চাই। আমার মতো করে পেয়েও গেছি। আর কী দরকার?"

শ্রাবস্তি চেয়ে আছে লোকটির দিকে। এখানে ট্রেনে ভিখারি গান গায়। সাধারণ লোক সংস্কৃত বলে। ওদেশে তো টিউবে 'সান' কিংবা 'ডেইলি মিরর' পড়ে লোকের কেচ্ছা হজম করে। ওরাও ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানিদের দিকে নাক সিটকিয়ে 'আনসিভিলাইজড' ভাবে। মা-ও তাই ভাবে। শ্রাবস্তিও তাই জানত। এখন বুঝছে টেলিভিশনের 'টিউটর্ড' শব্দটা সাধারণ মানুষকে কীভাবে প্রভাবিত করে। আজ সভ্যতার যন্ত্রবাক্সের বাইরে নতুন করে দুনিয়া দেখছে। অরিজিৎ আর শ্রাবস্তির সংশয় বুঝিয়ে দিচ্ছে, ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না।

"মিথ্যে বলছি না বাবু। সে আরেক কাহিনি"

একমনে শুনছে ওর কাহিনি "তখন দমদম লাইনে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করি। রেল লাইনের হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক লাইনে কাজ করতে গিয়ে শক লাগে। তারপর কিছু মনে নেই। নিমতলা ঘাটে ওরা যখন আমাকে পোড়াতে গেছে, চিতায় শুয়ে চোখ মেললাম। চুল্লির ওপর থেকে হেঁটেই নেমে এলাম। ওরা চিৎকার করতে লাগল 'বেঁচে আছে ভূত'। ওদের বোঝাতে চাইলাম, আমি বেঁচে আছি, ভূত নই। কেউ বিশ্বাস করল না। ভূত ভেবে আমাকে একঘরে করে দিল। বউ মেয়ে ছেড়ে চলে গেল। ভেতর থেকে তখন সংস্কৃত শ্লোক বেরচ্ছে। ওরা বুঝতে পারছে না আমার মতো অশিক্ষিত কী করে সংস্কৃত বলে যাচ্ছে? শেষমেশ চাকরিটাও গেল। শুনেছিলাম ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হয়ে গেলে সেই লোককে চাকরিতে রাখা যায় না"

একটু থামল "আমার নাম ত্যাগী মুরমু। চাকরি নেই। সংস্কৃত দিয়ে তো পেট চলে না। শেষমেশ লালুপ্রসাদ যখন ডানকুনি লাইন উদ্বোধনে এলেন, কেঁদে পায়ে পড়লাম। কেন জানি না, লালুজির দয়া হল। ব্যান্ডেলে খালাসির চাকরি দিলেন"

ওর চোখের কোণায় কয়েক বিন্দু চকচক করছে। হয়ত গুল মারছে না। সত্যি কথা বলছে। চোখের জলে ফুটে উঠছে মনের ভাষা।

"আজ আমার কেউ নেই। তাতে কিছু যায় আসে না। আমার ঈশ্বর আছে। বোধ আছে। আর কিছু চাই না"

এমনও কি হয়! শ্রাবস্তি বিশ্বাস করতে পারছে না। মির‍্যাকেলসের কথা গল্পে পড়েছে। বাইবেলেও। সি ক্যাড ন্যারেট এ ফিউ সামস বাই হার্ট। অ্যান্ড হিয়ার ওয়াজ দিস অর্ডিনারি ম্যান টকিং রিলিজিয়ন উইদাউট এনি নলেজ অফ ইট অর বুক টিচিং।

ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া!

খাটে শুয়ে অরিজিতের মনে হল, শ্রাবস্তির দোটানাটা তার মধ্যে রামধনুর রঙের ক্যালিডোস্কোপ। যদি শ্রাবস্তি মেয়ে না হয়ে, ছেলে হত? অরিজিৎ কী তাকে ছেড়ে আসতে পারত? ছেলে বংশের বাহক। তার নাম, পদবি, পরিচয়, লিগ্যাসির ধ্বজা। আর মেয়ে? সে তো, তার নাম নিয়ে বেঁচে থাকবে না। তার লিগ্যাসি বহন করবে না।

আজ এই অর্ধশিক্ষিত লোকটার কথা তাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। হোক না অবিশ্বাস্য ঘটনা। ঘটনা তো। এগুলোই কী স্বর্গ-নরকের মেলবন্ধন? দ্য মিসিং লিঙ্ক! তবে কী শ্রাবস্তিকে ফেলে আসার চিন্তা নরকের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে? পুত্র-পৌত্র-পুন্নাম। নরক থেকে উদ্ধার।

রাত কত কে জানে? অনুভব করছে, এই নিষ্পেষণ শুধু শ্রাবস্তিকে কুরে কুরে খাচ্ছে না। তাকেও। ত্যাগী মুরমু তাকেও ফেলে আসা অতীতের দোটানায় দাঁড় করিয়েছে।

****

পকোড়া চা শেষ করে গাড়িতে উঠতে যাবে, হঠাৎ সামনে একটি বাচ্চা মেয়ে। বছর ছয় হবে। অন্ধ বাবার হাত ধরে হেঁটে চলেছে।

বাবার গলায় চিরন্তন অন্ধকারের শব্দঃ

আমার দুখে দুখে জনম গেল গো

গুরু সুখ তো আমার সইল না

জনম দুখি কপালপোড়া গুরু

আমি একজনা

মঞ্জরীর বুকটা কেঁপে উঠল। কার গান গাইছে? নিজের, মঞ্জরীর না অরিজিতের? মানবজীবনের প্রায়শ্চিত্তের সুর? ফেলে আসা পুরনো স্মৃতি নাড়া দিচ্ছে। ফুলশয্যার কথা নয়। স্বামী-মেয়ে নিয়ে সুখের

দিনের কথাও নয়। সুখটাকে কখনও সোনার খাঁচায় বন্দি করতে চায়নি। তবুও এক অদৃশ্য শক্তি অদেখা সোনার খাঁচাটাকে খুলে দিয়েছে। সাদা পায়রাটা, একদিন ট্রেনের কামরার খাঁচা ছেড়ে, নীল আকাশের অনন্ত নীলিমায় উড়ে গেছে। বোঝার আগেই সব শেষ। ফাগুয়ার আবেশ অনুভব করার আগেই জীবনের রং ধূসর। এখন পড়ে হারানো ব্যথার বেহাগ। রাতারাতি সব উল্টে-পাল্টে গেল। সুখ সইল না।

অরিজিৎ অনুভব করছিল মঞ্জরীকে। বা নিজেকে। সব পেয়েও না-পাওয়ার ঝংকার। জীবনের প্রায়শ্চিত্ত। কেন এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে আঁকড়ে মানুষ বাঁচতে চায়?

ভিক্ষা চায়নি। তবুও মেয়েটির হাতে একশো টাকা গুঁজে দিল। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে "বাবু এত টাকা। লোকে আমাদের চোর বলবে"

মেয়েটার হাতে টাকাটা চেপে বলল "চোর বলবে কেন? আমাদের সবকিছুই তো তাঁর-ই দান। আমরা সবাই ভিখারি। তাঁর ভিক্ষাই নয় ভাগাভাগি করে নিলাম"

গাড়িতে উঠে বসল অরিজিৎ। মঞ্জরী তখনও চেয়ে আছে মেয়েটির দিকে। নিজের মেয়েকে কী খুঁজছে ওর মধ্যে?

স্টিয়ারিংয়ে বসে যতদূর চোখ যায়, অরিজিৎ চেয়ে আছে মোটোরওয়ের শেষ প্রান্তে। আলোয় রাস্তাটা মিলেমিশে একাকার। তারপর আর দেখা যায় না। ভাবা যায় না।

ছোট্ট টুম্পা কী ওই বয়সে ও-রকমই ছিল? মনে পড়তেই চোখ ছলছল। ছবিটা অস্পষ্ট হলেও অনুভূতিটা এখনও সকালের রোদের মতো উজ্জ্বল। নীরব ব্যথার একা পূজা। যে পূজা দিতে সে ক্লান্ত।

কেনই বা বাঁচা?

কেনই বা আশা?

কেনই বা চাওয়া?

পেলেই বা কী হবে?

গাড়ি বাঁক নিল দিল্লি এক্সপ্রেসওয়ের অজানা পথে। মাঝে একটু বিশ্রাম। আনন্দকে কাঁপিয়ে দিয়েছে নিরানন্দ স্বরে। ভাষাহারা ঢেউ আছড়ে পড়ছে নোঙরহীন তীরে। মুক্তি নেই। পরিত্রাণ নেই। তবুও বরণ করে অনির্দিষ্টের পথে এগোনো। দুর্গাপুর পার হয়ে মাইথনের দিকে। হঠাৎ ঝট করে ইউ-টার্ন। অবাক মঞ্জরী বলল "ফিরে যাচ্ছ?"

"না। তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাই" একটু এগিয়ে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘোরাল।

এসে দাঁড়াল ছোট্ট মন্দিরের হাটে। ছোট ছোট বাঁশের ওপর তেরপল বাঁধা বিকিকিনির শিবির। সাদা ইটের দেওয়াল ঘর। পান-বিড়ির দোকান। বেশিরভাগ দোকানদারদেরই ভিড়। গুটিকয়েক লোক হেঁটে বেড়াচ্ছে। ডান দিকের ল্যাম্প পোস্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে ইলেকট্রিসিটি কোনও বাড়ির দিকে। শুকনো ঘাসের সরু পথে, দু-পাশের তেরপল আর টিনের চালের ফাঁক দিয়ে মঞ্জরী দেখল, দূরে একটা লাল মন্দির।

অরিজিৎ বলল "এটা ঘাগড়বুড়ির মন্দির। এস"

পকোড়ার টুকরোগুলো ঝেড়ে বলল "খুব জাগ্রত"

মঞ্জরীর মনে হল, এই লোকটা কী বিলেতে টিকতে পারত? কলকাতায় এত বছর। এখানে যে একটা মন্দির আছে, জানত না। এই ইটোনিয়ান অ্যাকসেন্টভাষী সেটাও জানে। ওর চোখ দিয়ে নতুন করে দেখছে তার দেশকে। তার জন্ম-মাতৃভূমিকে। মা হয়ে যে কাজ পারেনি, পুরুষ অরিজিৎ তাকে দেখাচ্ছে আরেক মাকে। জননী জন্মভূমি। কেন যে মানুষ ব্যথার অনন্ত সাগরে আশ্রয় খোঁজে? শান্তি কী ওই পাথরের কতগুলো মূর্তির মধ্যে লুকিয়ে? কেউ জানে না। তবুও ছোটে পাথরের প্রতি। না কি, অনন্ত অজানাকে রূপ দিতে চায় পার্থিব আকারে? মন পার্থিব আশ্রয় চায়। চলার পাথেও। বেঁচে থাকার সহচর। মুহূর্তের নীরবতা। কোনও পীঠস্থানে।

মঞ্জরীর মনে পড়ল মেয়েকে নিয়ে যেদিন বেলুড় মঠে গেছিল। সেদিন গঙ্গার শান্ত নীরবতা পুণ্যের থেকেও বেশি আকৃষ্ট করেছিল। টুম্পা বলেছিল "মা, স্বামীজি কী মানুষ ছিলেন?"

চমকে উঠেছিল! বলে কী। পরমহংসদেব, স্বামীজি এরা দেবতা হতে যাবেন কেন?

"দেবতা হবেন কেন? আমাদের মতোই মানুষ"

"তবে কেন ওদের ছবি ঘরে টাঙিয়ে পুজো করে?"

"ওরা মানুষ হয়ে জন্মালেও, চিন্তায়, বিচার-বুদ্ধিতে ছিলেন অন্য জগতের"

টুম্পা স্টার ওয়ার্স দেখেছে। এক সময় এরিক ফন দ্যানিক্যানের লেখা 'দেবতারা কী অন্য গ্রহের মানুষ?' পড়েছে। বোঝেনি। লোকে যাকে পুজো করে, সেই তো দেবতা। এরা কেন? দেবতা আর মানুষের সূক্ষ্ম ভেদরেখাটা অজানা। ওই বয়সে বুঝতে অসুবিধা হয়নি, এক বিশাল শক্তি। যার ভাষা তার অজ্ঞাত।

ভেতরের ঝড়কে প্রকাশ না করে, অরিজিৎ বলল "চল, দর্শন করে আসি"

দু'ধারের তেরপল আর বাঁশের গুড়ির মধ্যে দিয়ে, ঘাস উঠে যাওয়া পায়েচলা পথে দূরের লাল বাড়িটা চোখে পড়ল। বাড়ির ওপরে দশভুজার দু'পাশে দুটো সিংহ। দশভুজাকে প্রহরীর মতো রক্ষা করছে। মাথায় অর্ধ গোলাকৃতি আচ্ছাদনের ওপর ছোট্ট ধ্যানমগ্ন শিবের মূর্তি। শিবকে ঢেকে রেখেছে বিস্তৃত সাপ। বাঁ দিকে ছোট্ট ত্রিভুজাকার লাল পতাকা। ডানদিকে ল্যাম্প, মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের আলো। গেট পেরতেই, বাঁ দিকে সিমেন্টের বাঁধানো ঢিপি। সেখানে গুটিকয়েক ছেলে আড্ডা মারছে। পার হতেই দেখল পেশিওর নীচে কিছু লোক। বুঝতে অসুবিধা হল না এটাই মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বার।

কলকাতার নামী-দামি ব্যারিস্টার এখানে কেন?

মঞ্জরী যেমন শীতে কোকিলের ডাক শুনতে পায়, তেমনি অরিজিতের বুকের তোলপাড়ও অনুভব করে। আবেগে মন যখন কেঁপে ওঠে, সবাই আশ্রয় চায়। ভাবে এক অদৃশ্য শক্তির কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়াতেই শান্তি।

অরিজিৎকে জিজ্ঞেস করল "মূর্তিপুজো মানো?"

যতটুকু দেখেছে, মেলাতে পারছে না, অরিজিতের ঘাগড়বুড়ির মন্দিরে পর্দাপণ। অসহায় অরিজিৎ আশ্রয় খুঁজছে। আত্মবিশ্বাসের পার্থিব রূপ। মন্দির, শ্রাবস্তি, মঞ্জরী, যেই হোক না কেন। দোদুল্যমান মন কিছু আঁকড়াতে চাইছে।

অরিজিতের হাতে চাপ দিল "ভেতরে এস"

****

খোলা আকাশে চোখ মেলল মঞ্জরী। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। বাঁ হাতটা নাড়তে দেখল তার সঙ্গে কোনও কিছু বাঁধা। ঘাসের ওপর, মাটির চাদরে শুয়ে। স্যালাইন চলছে। এখানে কী করে? পাশের মানুষগুলোকে চেনা যাচ্ছে না অন্ধকারে। চারদিকে হই-হট্টগোলের আওয়াজ। কয়েকটা অস্পষ্ট মানুষ এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। কারও হাতে হ্যারিকেন। অস্পষ্ট অবয়ব।

মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। চোখ বুজল। মনে পড়ল টুম্পা অমিতের সঙ্গে রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি যাচ্ছিল। এ তো রাজধানীর টু-টায়ার এসি স্লিপার নয়। খোলা আকাশের নীচে সতরঞ্চি।

অনেকদিন ধরেই টুম্পা বলছিল "চলো কোথাও বেড়িয়ে আসি"

খেয়াল করেনি। অফিস আর অমিতের বাউন্ডুলে কাজের চাপে টুম্পাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়নি। বেচারা মেয়েটা স্কুল, বাড়ি, গান নিয়ে পড়ে। যাদবপুরের লক্ষ্মণরেখায় আবদ্ধ। নেহাৎ মেয়েটা বইয়ের পোকা। আবদার করে না। দিল্লিতে মঞ্জরীর পিসতুতো বোন থাকে। তাই দিল্লিকে কেন্দ্র করে ভেবেছিল দেহরাদুন, নৈনিতাল, আলমোরা, কৌশানি ঘুরে আসবে। কিংবা ওপাশে চণ্ডীগড় হয়ে সিমলা, কুফরি, চেল। পরে ভাবা যাবে। আগে বেরিয়ে পড়া যাক।

বাঙ্কে মঞ্জরী আর টুম্পা। অমিত নীচে। অন্ধকারে চেয়ে। একটা বিরাট শব্দ। তারপর... আর মনে নেই।

অমিত টুম্পা কোথায়? পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করল "কী হয়েছে?"

"আপনাদের রাজধানীর বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। শুয়ে থাকুন। উঠবেন না। দেখি আর কে বেঁচে" প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কালস্রোতের প্রবাহে, সব স্মৃতিই একদিন ধূসর। সেই ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্টের স্মৃতিও সময়ের চাপে মলিন। সঙ্গে হারানোর যন্ত্রণা। অমিতের ডেডবডিটা ভালো করে চিনতেও পারেনি। মুখ থেঁতলে রক্তে মাখামাখি। বেশভূষা কার্ডগুলো দেখে, শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিল। মুহূর্তের মধ্যে একটা সাজানো সংসার নিশ্চিহ্ন। দিল্লি, দেহরাদুন হরিদ্বার সিমলা মিলেমিশে শূন্যতায় একাকার। টুম্পার দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধানে অপারগ সরকারি সংস্থা শেষমেশ মৃত বলে ঘোষণা করেছিল। মন মানেনি। আজও মানে না। তবু মেনে নিতে হয়েছে। উদাস মাতৃত্ব আজও খুঁজে বেড়ায় টুম্পাকে। রাস্তাঘাটে, সরকারি অফিস থেকে রেলকর্তাদের দরজায়। বৃথাই। যে গ্রহেই থাকুক না কেন, ছোট্ট টুম্পা ফিরে আসবে উষ্ণ বুকে। ঠিক আগের মতো দুহাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নেবে। টুম্পা আজও ফেরেনি। হয়ত আসবেও না। তার বদলে শ্রাবস্তি আসছে অরিজিতের কোল ভরতে। ওই জনমদুখি গান গাওয়া মেয়েটার মতো। অনেকদিনের জমা দুঃখের হিসেব মেলাতে।

শীতে কোকিল ডাকবে কি না কে জানে। যখন একবার শুনতে পেয়েছে, নিশ্চয়ই আবার ডাকবে। ব্যথার আঙিনায় আবার নতুনের সম্মুখীন হওয়া।

রেগুলার ক্লাসে মঞ্জরী একদিন বই আনতে ভুলে গেছিল। ছোটবেলায় পাশাপাশি স্কুলে।

"তোর বইটা দেখতে দিবি?" নীল স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ পরা মঞ্জরী, রঞ্জিতাকে প্রশ্ন।

"নাঃ"

"কেন?"

"বললাম তো না" মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল রঞ্জিতা।

মুখচোরা মঞ্জরীর সাহস হয়নি রঞ্জিতাকে আরেকবার প্রশ্ন করার। তারপর কত বছর। যে যার নিজের পৃথিবীতে। ছোটবেলার স্মৃতিগুলো টুকরো হয়ে ভেসে বেড়ালেও রঞ্জিতার স্মৃতি ম্লান। আজ সেই ম্লান স্মৃতির আত্মজ আসছে স্বপ্ন নিয়ে। টুম্পাকে নতুন করে দেখার প্রত্যাশায়। ছোটবেলার দুঃস্বপ্নের দিনগুলো মিলেমিশে একাকার। টুম্পা-শ্রাবস্তির যুগলবন্দিতে। জীবন আবার নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে, দুই মাতৃত্বের দোলায়।

জানত না মঞ্জরী। অরিজিৎই একদিন কথাচ্ছলে বলেছিল "রঞ্জিতা কারমেল কনভেন্টে পড়ত"

"আমিও তো কারমেল কনভেন্টের। রঞ্জিতা কী নাচত?"

"হ্যাঁ। গীতাদির কাছে শিখেছিল"

"আমার ক্লাসমেট। চিনতাম। জানতাম না, তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে"

চমকে উঠেছিল অরিজিৎ। বুঝতে পারেনি, বিভিন্ন রূপে কারমেল কনভেন্ট কেন বারবার তার জীবনে। স্বাভাবিক স্বরে বলেছিল "পৃথিবীটা কত ছোট। তাই না?"

মুখে স্বাভাবিকতা থাকলেও, মনে আশঙ্কা। সেই কারমেল। রঞ্জিতা, মঞ্জরী। বারবার একই গোলকধাঁধায় কেন? পৃথিবীটা গোল বলে? নাকি প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্বর সঙ্গে মিশে থাকে কতগুলো অলিখিত সত্য। ভালোবাসা, ঘর, সংসার। চাওয়া, পাওয়া, বিরহ, মিলন সব কিছু একই তারে বাঁধা। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনই স্বরলিপিতে সীমিত। বিভিন্ন সুরে, রূপে, রঙে, আবেগে আত্মপ্রকাশ করে। তবুও সূত্রটা অলিখিত ছন্দে বাঁধা।

অরিজিতের একবার মনে হয়েছিল, কারমেল তার জীবনে কী, ভালো না মন্দ? সময় উত্তর দেবে। অস্বীকার করতে পারেনি সূত্রধারকে। প্রবহমান সময়ে অনেক কিছুই পাল্টায়। পাল্টায় না সূত্রের রেশ। বোকা মানুষ সেই সূত্রের ঠিকানাই জানে না। জানবে কী করে কোন সুতোয় বাঁধা রয়েছে জীবন?

মঞ্জরী বলল "কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বল-তো?"

অরিজিৎ মোটরওয়েতে তাকিয়ে বলল "জানি না। বোধহয় জাহান্নামে"

মঞ্জরী বুঝতে পারল না জাহান্নামটা কদ্দুর।

****

জাহান্নামটা যে এত সুন্দর মঞ্জরীর জানা ছিল না। ডানদিকের লরিগুলোর ফাঁক দিয়ে অরিজিতের গাড়ি বাঁক নিল মাইথনের দিকে। কিছু দূর যেতে টি-জাংশনের বাঁ দিকে ঘুরে অরিজিৎ ডাইনে দেখাল "এটা কল্যাণেশ্বরীর মন্দির"

দেব-দেবি থেকে দূরের লোকটা, কী করে এত মন্দিরের নাম-ঠিকানা জানল বুঝে উঠতে পারল না। সাহেবিয়ানার বাইরে যে বাঙালিত্ব লুকিয়ে, আঁচ করেছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলার গলি-ঘুপচি মন্দিরের হদিস গুলে খেয়েছে, বুঝতে পারেনি।

পাহাড়ের গা বেয়ে কাঁচা রাস্তায় সেকেন্ড গিয়ারে গাড়িটা নিয়ে বলল "সোজা রাস্তাটা মাইথন ড্যামের দিকে চলে গেছে। ড্যাম পার হলেই পঞ্চকোট পাহাড়। গড়-পঞ্চকোটেও থাকা যেত। বড্ড কমার্সিয়াল। আমার ভালো লাগে না"

পাহাড়ের ওপর ডাক-বাংলোর পাশে, নদীর দিকে চোখ পড়ল। অরিজিৎ গাড়ি থেকে নেমে বলল "ভেতরে এস"

বারান্দায় হাঁটতে স্বর্গ যেন তার দুয়ার খুলে দিল। সামনে নিরুত্তাপ বরাকর নদী। নদীর ওপর মাইথন ড্যাম। গ্রিল গেট ধরে দাঁড়িয়ে, সামনের বাগানে নাম না-জানা ফুলের দিকে চেয়ে মঞ্জরী হারিয়ে গেছিল। নিজের ঝরা ফুলকে খুঁজছে ওদের মধ্যে। টুম্পা থাকলে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াত এই বাগানে। কোথায় আছে? যদি বেঁচে থাকে, ঠিক আছে তো? আর না থাকলে? ভাবতেই শিউরে উঠল। মায়ের মন কিছুতেই মানতে চায় না।

টুম্পার তখন কতই বা বয়েস। তিন-চার হবে। বায়না ধরেছিল, ভাইজ্যাগ যাবে। অমিত এমনিতেই ঘরকুনো। বেরতে চাইত না। মেয়ের বায়না, বউয়ের আবদার। বিয়ের পাঁচ বছর হল। হনিমুনও করে উঠতে পারেনি। যাদবপুরের একতলা ঘরেই হনিমুনের মধ্যে টুম্পার জন্ম।

টুম্পা যখন বায়না ধরল “মা, বাপিকে বল না, বেড়িয়ে আসি” মঞ্জরীর মনে হয়েছিল, নিজের জন্য না হোক, মেয়ের জন্য একবার বেরনো দরকার। অমিত নন-অ্যাডভেঞ্চারাস। অচেনা জায়গায় যাওয়ার থেকে চেনা জায়গাই বেশি পছন্দ করে। কর্মসূত্রে ভাইজ্যাগ ঘোরা। প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম। যাওয়া যেতেই পারে। পাহাড়ের ওপর ফরেস্ট বাংলোয় বরাকরের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল, টুম্পাকে নিয়ে ভাইজ্যাগ যাওয়ার কথা। কালো বোল্ডারের স্তূপ। এখানে ওখানে মাথা উঁচু করে ঢেউয়ের সঙ্গে এক অন্তহীন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের জলের রং নীলচে, ঘোলাটে। প্রবল বিক্রমে সমুদ্র আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ডাঙা কিন্তু দখল ছাড়েনি। নিহত সৈনিকের মতো বোল্ডারগুলো পড়ে সমুদ্র আর ডাঙার নোম্যানস ল্যান্ডে।

রামকৃষ্ণ বিচ।

বাঙালি সারা ভারতে বা একটু বাড়িয়ে বললে, সারা পৃথিবীতে যেটুকু সন্মান পায়, তার পিছনে এই মহাপুরুষের অবদান আঠারো আনা। বাংলার বাইরে রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দের নাম দেখলে সব বাঙালিরই বুক ভরে ওঠে।

টুম্পা বেলুড় মঠে প্রশ্ন করেছিল “রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ কী ভগবান? তবে লোকে ওদের পুজো করে কেন?”

সেকথা মনে হতেই কেমন কেঁপে উঠল। অস্পষ্ট ভগবানের অবয়বে তার বিপুল শক্তিকে মানুষের অন্তর বারবার খোঁজে চেনা-জানা চৌহদ্দির মধ্যে। মঞ্জরীর আত্মাও নিরাকারকে আকারে বন্দি করতে চাইছে।

বাংলাদেশের বাইরে, বিশাখাপত্তম বা ভাইজ্যাগে রামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত সমুদ্রসৈকত অমিতেরও ভালো লাগে। নানা কাজে, অনেকবার এসেছে। স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে আসাই অন্যরকম।

লম্বা বিচ।

জলের মাঝে অসংখ্য কালো পাথরের চাঁই এখানে ওখানে মাথা উঁচু করে। স্নান করা খুব সহজ নয়। তবুও অনেকেই জলে নেমে পড়েছে। সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে অনেক দূরে বাঁদিকে সাবমেরিন মিউজিয়াম চোখে পড়ে। আইএনএস কারসুরা। বিগতযৌবন সাবমেরিনটি ভারতীয় নৌবাহিনী থেকে রিটায়ার করে আজ সাগরতটে যাদুঘরে পরিণত। আদর করে তার নাম দেওয়া হয়েছ ‘স্মৃতিকা’। অতল সমুদ্রের আহ্বান ছেড়ে এখন সে অগুনতি দর্শকের অবাক হওয়া চোখ, মনের কৌতূহল মেটায়। যখনই এই সাবমেরিনটাকে এ রকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখে, অমিতের খুব কষ্ট লাগে। গুনগুনিয়ে ওঠেঃ

বদ্ধ পৃথ্বীর মুখর সুর গায় অজানার গান।

ভাঙতে চায় মনের দুয়ার ছুটে অবিরাম।।

মঞ্জরীর মনে হল, আমরাও ঠিক এরকম না? ইচ্ছের হাত-পা বেঁধে, মনের আহ্বানকে জোর করে বন্ধ করে, না শোনার ভান করে জাদুঘর হয়ে পড়ে আছি।

হারিয়ে গেছিল। পেছন ফিরে দেখল অরিজিৎ নেই। ঘরটায় উঁকি মারল। খালি গায়ে পাঞ্জাবি পরছে। মঞ্জরীকে উঁকি মারতে দেখে বলল “পাশের ঘরটা তোমার”

অরিজিতের বলিষ্ঠ দেহ আগে কখনও দেখেনি। ফুলশয্যার স্মৃতি আজ ঝরা পাপড়ি। সেই প্রথম। সেই শেষ। অনুভূতির অবাঞ্ছিত অবশেষ।

ঘরে ঢুকে কাফতানটা বার করে, মঞ্জরীর মনে হল, সত্যি কী যৌবন শেষ? আর কী পুরুষের চাহিদা নেই? না পুরুষ-মহিলা নির্বিচারে পার্থিব অবয়ব খুঁজছে?

টুম্পা প্রশ্ন করেছিল “তোমরা রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীকে পুজো কর কেন?”

সহজ-সরল বাচ্চা মনের প্রশ্ন। অথচ উত্তরটা জটিল। না-জানা ঈশ্বররূপী বিগ্রহ পুজোর চেয়ে জানা ইতিহাস আঁকড়ালে, কাছের মনে হয়। সেটা যেই হোক না কেন। রামকৃষ্ণ-সারদা মা বা বিবেকানন্দ। পাথরের মূর্তির থেকে জলজ্যান্ত মানুষের অবয়ব অনেক বেশি আকর্ষণীয়। পাথরের শিবকে কল্পনায় ভাসানোর থেকে, সশরীর অবয়ব শিবমূর্তি, শূন্যতার মধ্যে বেশি পূর্ণতার ছোঁয়া দেয়।

সে ভাবেই কী অরিজিতের অবয়ব নারীত্বের সুপ্ত অনুভূতিতে আলোড়ন তুলছে? নাকি, হৃদয়ের নিঃশব্দ আঙিনায় আবার ফুল ফোটাতে চাইছে বিচিত্র আভরণে। না-চেনা অনুভূতির নতুন জাগরণে। মানুষ-ঈশ্বরের যুগলবন্দির সুরে।

ফিকে আলোয় মনে হল শীতের ছোট দিন ক্রমে গোধূলিতে মিশছে। বাইরে বেরিয়ে দেখল, পড়ন্ত দিনের ধূসরে অরিজিৎ একদৃষ্টে চেয়ে আছে রক্তিম আভায় স্নাত বরাকরের শেষ সূর্যর দিকে। রক্তিম আভা জানান দিচ্ছে, দিন এখনও শেষ হয়নি।

কাফতান পরা মঞ্জরীকে পাশে দাঁড়াতে দেখে চশমাটা রুমাল দিয়ে মুছল "ঘুম হল?"

মিঠে আলোয়-স্নাত স্বগতোক্তি "চা দেবে না?"

"বলেছি। আনছে। অপেক্ষা করছিলাম। ঠান্ডা না হয়ে যায়"

ক্যানন ইক্সাস ক্যমেরায় শেষ আভাকে ফ্রেমে বন্দি করছে। মুহূর্তটাকে। শুধু নদী নয়, ব্যথার নৈবেদ্যকেও সাজাতে চাইছে মনের ছন্দে। নতুন অনুভূতির আনন্দে। শ্রাবস্তি আসছে। ছোট্ট দুটো হাত বাড়িয়ে তার দিকে "হোয়াই ডিড ইউ ডেসার্ট মি ড্যাড?"

আবারও মনে হল, মেয়ের বদলে ছেলে হলে কী পারত? ছেলে বংশের ধ্বজা। পদবির সাক্ষী। ভয়, ব্যথায় বুকটা কেঁপে উঠল। নরকের ভয়? পুত্র-পৌত্র-পুন্নাম। নরক থেকে উদ্ধার। মেয়ে আসার খবরে ভালো লাগছে কেন? মেয়েকে এত বছর পরে দেখতে পাবে? না কি, সমাজের কাছে ভাবমূর্তি সবল হবে? না কি, অবচেতনে জিনের প্রপাগেশনে ভরসা? শূন্য জীবনের পূর্ণতা। তা ঘাগরবুড়ি বা কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরে নেই। আছে উত্তরসূরির রক্ত-মাংসের শরীরে। অতৃপ্ত মন সান্ত্বনা খুঁজছে পার্থিব অবয়বে।

সান্ধ্য প্রসাধনে মঞ্জরী। আকাশি নীল শাড়ি। সাদা হাফ-হাতা ব্লাউজের ওপর কাশ্মীরি কালো শাল ফেলে বারান্দার প্লাস্টিকের চেয়ারে বসল। হাল্কা হলেও ঠোঁটে লিপস্টিক। মিস্তি দ্য রোশাসের মিষ্টি সুবাস। নতুন রূপে সাজার ইচ্ছা? কী সে রূপ?

"মেয়ের কথা খুব মনে হচ্ছে, তাই না?"

বুঝতে পেরেও এড়িয়ে গেল অরিজিৎ "তোমারও তো"

"কী করে বুঝলে?"

"তোমাকে সূর্যাস্তের দিকে তাকাতে দেখে মনে হল, হারিয়ে গেছ অন্য এক জগতে"

অরিজিৎ কী করে যে মনের কথা ধরে ফেলে। মঞ্জরীর মনে হল, নৈঃশব্দ্য কথা বলে। সুর, তান, লয়। ভাষাহীন স্তব্ধতা নিঃশব্দে খুঁজে নেয় স্বপ্নের বনলতাকে।

"সতেরো বছর পরেও দুঃখটাকে হজম করতে পারনি"

"তুমিও তো পারনি সাত বছর পর"

"এই দুঃখ নিয়েই বাঁচাতে হবে। বাকি জীবনের শান্তি খুঁজে নিতে হবে। তোমার তো শ্রাবস্তি আসছে। আমার টুম্পা কোনওদিনও ফিরে আসবে না" দীর্ঘশ্বাসে মিলিয়ে গেল স্বর।

ঝিঁঝিঁ পোকার কলরব অজানা রাগিনী বাজাচ্ছে। ছন্দহীন ছন্দ। পাওয়ার আনন্দ। চমকে উঠল অরিজিৎ। কী পাবে? পেলেই বা কী হবে? কেনই বা এ চাওয়া? আর না পেলেই বা কী যায় আসে? একি অবচেতনে নিজেকে অমর রাখার প্রয়াস? অ্যান্টিকুইটিতে চুমুক দিল "কী বেশে কে আসে কে জানে? যে বেশে, যে পরিবেশে আসে, সে কি আমার? কে জানে?"

"তোমার মধ্যে এত দোটানা কেন?" কাশ্মীরি শালটা জড়িয়ে ভডকায় চুমুক "আমার কোনও চাওয়া নেই। ফুরিয়ে গেছে! তোমার এখনও পড়ে। কেন? কী পাবে শ্রাবস্তি এলে?"

চুমুক দিয়ে বলল "এই বয়সে, পাওয়া হারানো অবান্তর"

"তোমার কাছে অবান্তর। আমার নয়। জীবন ফুরিয়ে যায়নি" মঞ্জরীর কটাক্ষ।

সত্যি তো। কারও জীবন ফুরায়নি। তবুও প্রত্যেকে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছে। ঘাগরবুড়ির ঈশ্বর? শ্রাবস্তি? না অন্য কিছু? টুম্পাকে মনের গভীরে ঢেকে রাখতে পারে, অরজিৎও শ্রাবস্তিকে। পাওয়া না-পাওয়ার ধোঁয়াশায়। সবের পেছনে একটাই সত্যি। বিভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করলেও, মর্ম একটাই। মন খোঁজে মন। সারাক্ষণ।

চাওয়া না-পাওয়ার দোলায় কেঁপে ওঠা মঞ্জরী বলল "শ্রাবস্তির ছবিটা দেখাবে? ই-মেলে পাঠিয়েছিল না?"

মোবাইল ফটোস ঘেঁটে এগিয়ে দিল।

"ঠিক তোমার মতো। ঠোঁট। হাসি"

"রঞ্জিতার ছাপও আছে। তুমি তো ওকে চিনতে?"

"সেই ছোটবেলায়। এখন নিশ্চয়ই অনেক পাল্টে গেছে"

"হবে হয়ত" আকাশে তাকিয়ে ঝিঁঝি পোকার কলতানের মধ্যে কথা ছুড়ে দিল। ওই কলতানে নতুন সুর খুঁজছে। ব্যথার সুর। মনের সুর। হয়ত বা পূর্ণতার সুর। চেয়ার ছেড়ে ঘরে ঢুকে গেল অরিজিৎ।

কলতানে, মোচড়ানো শূন্যতাকে, শান্ত করতে চাইছিল মঞ্জরী। শ্রাবস্তির ছবি। ঝাপসা হওয়া টুম্পার ছবি। অদৃশ্য সূত্রে, ছন্দ খুঁজছে। চিরন্তন নারী হৃদয়ের ডাক। নারীর পূর্ণতা। ব্যথায় বুকটা মুচড়ে উঠছে। চোখ ছলছল। হারিয়ে যাচ্ছে সুদূর অন্ধকারে। মাইথন ড্যামের ঝলমলে আলোগুলো জানান দিচ্ছে, অন্ধকারের মধ্যেই দিয়া জ্বলে। এখনও শেষ প্রান্তে ঠেকেনি। অরিজিৎ অনেকক্ষণ ঘরে। কী করছে? ভেসে এল, ভেতর থেকে গোঙানির শব্দ। ভয়ে উঠে পড়ল মঞ্জরী। দরজায় কান পাতল অজানা আশঙ্কায়। আস্তে ডাকল "অরিজিৎ"

সাড়া না পেয়ে ঘাবড়ে গেল। সাহস করে, আধা ভেজানো দরজা ঠেলে, অন্ধকার ঘরে ঢুকে দেখল খাটে শুয়ে অরিজিৎ। অস্ফুট কান্নার আওয়াজ। অরিজিৎ কাঁদছে?! পাশে বসল। আলতো করে হাত রাখল ওর গালে। জলে ভিজে গেছে। মুছে দিল।

কয়েক মুহূর্ত।

নিজের দুচোখ বেয়েও নেমে এল অসময়ের শ্রাবণধারা। এক অসহ্য দুঃখ দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙেচুরে তোলপাড় করে দিচ্ছে। যা আসেনি, যা পায়নি, যা হবে না, যা বলেনি, সব কিছু দলে-পিষে অচেনা অজানা বিস্ময় হয়ে বিশাল জটায়ুর মতো আগলে ধরল।

অরিজিতের দ্রুত শ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। শোয়া অরিজিৎ অন্ধ আবেগে বুকে টেনে নিল মঞ্জরীকে। কিছু বোঝবার আগেই, ঠোঁট দুটো ওর মধ্যে ডুবিয়ে দিল, পূর্ণতার খোঁজে। পুরো শক্তি দিয়ে আকড়ে। একটা আশ্রয়। সম্পূর্ণতা। ঘাগরবুড়ির মন্দিরে নেই। শুধুই মানুষের উষ্ণতার বাহুবন্ধনে।

বিছানায় শুয়ে দুটি মানুষ কাঁদছে। একটা অনুরণন। চাওয়া-পাওয়ার সাগর পেরিয়ে দুঃখের দ্বীপে পৌঁছে গেল ওরা দু'জন। দুঃখের ধারায় ভিজে অসহায় ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে, অলৌকিক নীড়ে।

না বা হ্যাঁ, কিছু বলার অবকাশই নেই মঞ্জরীর। ব্যথায় কাঁপা-কাঁপা শরীর অরিজিৎকে সঁপে, ওর মধ্যে, সম্পূর্ণ উজাড় নিঃশেষ করে দিতে চাইল নিজেকে। টুম্পা কোনওদিন ফিরবে না। শ্রাবস্তির উপস্থিতিটাও ধোঁয়াশা। তার জীবনে এখন একটাই সত্য। তার গায়ে লেপটে থাকা উষ্ণ রক্ত-মাংসের উত্তাপ। তার অর্ধ-সমাপ্ত নারী-জীবনের পূর্ণতার বিকাশ। যাকে সঁপে আবার খুঁজে পাবে হারিয়ে যাওয়া নারীত্বকে।

মাইথন ড্যামের ঝলমলে আলোটাও হারিয়ে গেল অন্ধকারে, দুই হৃৎপিণ্ডের ঘনঘন স্পন্দনে, দুই আত্মার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে। অরিজিৎ এই মুহূর্তে হারিয়ে যেতে চাইছে মঞ্জরীর মধ্যে। মঞ্জরীও নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে, একমাত্র পার্থিব আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে, মিলনের স্বর্গে। দুঃখের দুই নৌকো, দামাল ঝড়ের দাপটে, অন্তহীন সময়ের সাগরে, অসহায়তার পাল তুলে বাঁচতে চাইল, না পাওয়া শ্রাবণধারায় ভিজতে ভিজতে।

****

অখণ্ড নীরবতায় তিন সাগরের প্রয়াগে পলকহীন চেয়ে শ্রাবস্তি। ভারতবর্ষের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের ওপর স্মৃতিসৌধে দাঁড়িয়ে, মনে পড়ল ল্যান্ডস এন্ডের কথা। প্লিমাউথ থেকে ডার্টমুরের ওপর ড্রাইভ করছিল ল্যান্ডস এন্ডের দিকে। ডার্টমুরটা কোথায় বুঝতে পারেনি।

সাইকেলে এক ব্রিটিশ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিল "হোয়ার ইজ ডার্টমুর?"

সাইকেল থামিয়ে সাহেব বলেছিল "দিস ইজ ডার্টমুর। অ্যাট দ্য মিডল অফ এভরিওয়ার অ্যান্ড নোহোয়ার" বলেই হেসে পেডল চেপে এগিয়ে গেছিল।

বে অফ বেঙ্গল, ইন্ডিয়ান ওসন, অ্যারাবিয়ান সির মহাপ্রয়াগে দাঁড়িয়ে সে কথাই মনে পড়ল। একদিকে অস্তগামী সূর্য শেষ রশ্মির আভা ছাড়াচ্ছে আরব সাগরে। লালচে জল আরো লাল। সেই জলে রহস্যময়তা। অন্যদিকে পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি মারছে বঙ্গোপসাগরে। নীল জলরাশি সন্ধের আধো অন্ধকারে চাঁদের আলোর রিফ্লেকশনে আশ্চর্য মোহময়। দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের অনন্যতা বিস্তার করে নীলচে-কালোর গভীরে।

অনুভূতির মহাসঙ্গম। সব পাওয়া না-পাওয়া, দেখা না-দেখা, চেনা না-চেনা, বিশাল প্লাবনে একাকার। সেই দৃশ্যের মাঝে উঁকি মারছে গোধূলিতে সিলুয়েট হওয়া বিবেকানন্দ রক। চূড়ায় বিবেকানন্দ টেম্পল ।

আজ খ্রিস্টমাস। লন্ডনে স্যান্টা 'জিংগল বেলস' গাইছে।

অরিজিৎ বলল "১৮৯২ সালে এমন খ্রিস্টমাসের দিনে স্বামী বিবেকানন্দ সমুদ্রে সাঁতার কেটে এই রকসে এসেছিলেন"

"হোয়াই ডিড হি সুইম? ওয়াজ দেয়ার নো বোট অ্যাট দ্যাট টাইম?" শ্রাবস্তি ভাবতে পারে না, কেউ সাঁতার কেটে ৫০০ মিটার পাড়ি দেবে। সে তো নৌকায় এসেছে।

"দেয়ার ওয়াজ এ বোট অ্যাট দ্যাট টাইম। বাট হি হ্যাড নো মানি। আসার আগে স্বামীজি সারা ভারত ঘুরেছিলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২ কন্যাকুমারীতে পৌঁছন। এক্সহস্টেড অ্যান্ড পেনিলেস স্টেয়িং অ্যাট কনিয়াকুমারি হি নিডেড টু কাম টু দিস আইল্যান্ড, নট ওনলি টু মেডিটেট, বাট অলসো, টু সি দ্য ফেস অফ মাদার ইন্ডিয়া ইন ইটস এন্টায়রিটি"

শ্রাবস্তির চোখে বিস্ময় "ওয়াস দেয়ার নো সার্কস ইন দ্য সি?"

"ছিল। হি কুডন্ট কেয়ার লেস। হি নিডেড দ্যাট সলিচুড। মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন টু অ্যাড্রেস দ্য ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়াস কংগ্রেস ইন শিকাগো ইন ১৮৯৩"

গতকাল কলকাতা থেকে থিরুবন্তপুরমে ফ্লাইটের পর, গাড়ি করে ড্যাড দেখিয়েছে কোভালাম, নাগরকয়েল, সুচিন্দ্রাম। দীর্ঘ ৮৭ কিমি ঘুরে রাতে কন্যাকুমারীতে যখন পৌঁছয়, দেহে কিছু নেই। সমুদ্রতীরে বিবেকানন্দপুরমের কটেজে গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ খেয়াল নেই। উত্তাল সমুদ্রের কলরবে, খিদেয় ঘুম ভেঙেছিল। বাইরে বেরিয়ে দেখল, বাবা ইজিচেয়ারে সমুদ্রে তাকিয়ে।

"ইউ মাস্ট বি হাঙ্গরি?" অরিজিৎ বলল।

"ইয়স ড্যাড"

শ্রাবস্তি চেয়ার টেনে অরিজিতের পাশে বসল। চেয়ে আছে অনন্তবিস্তৃত জলরাশির দিকে। মাতাল ঢেউগুলো পাড়ে আছড়ে পড়ছে। অনেক পথ চলার পর তীরে আশ্রয় খুঁজছে। তীর তাকে শান্ত করে ফিরিয়ে দিচ্ছে। সেখানে ক্ষণিক বিশ্রাম নতুন উদ্দামে ফিরে যাওয়ার আগে।

খাবার অর্ডার দিয়ে, অরিজিৎ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল "ড্যু ইউ নো হাউ দিস নেম কেম?"

"নো"

"পুরাণে বলে দ্য স্যক্রেড ওয়াটারস অফ দিস হোলি প্লেস অ্যাবসলভস ওয়ান, অফ অল সিনস"

“ইজ দ্যাট সো? রিমেম্বার দে সেইড দ্য সেম হোয়েন মেকিং এ উইশ থ্রোয়িং পেনিস অ্যাট দ্য ট্রেভি ফাউনটেনস ইন রোম” চেনা ইউরোপকে মেলাতে চাইছে, এই বিশাল উপ-মহাদেশের সঙ্গে।

“অ্যাকর্ডিং টু দ্য লিজেন্ড অসুররা ঈশ্বরদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তার ফলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে অরাজকতা। এদের মধ্যে বানাসুর নামে এক দানব, পৃথিবীতে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছিল। সন্তানদের এই কষ্ট সহ্য করতে পারছিলেন না মাদার আর্থ। তিনি ভগবান বিষ্ণুর সাহায্য নেন। উনি বলেন, ঈশ্বরেরা যদি ডিভাইন মাদার পরাশক্তির সাহায্য নেয়, তবেই একমাত্র বানাসুরাকে থামাতে পারবে”

বাবা তাকে ভিন্ন রাজ্যের ফেয়ারি টেল শোনাচ্ছে। যেমন ছোটবেলায় অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড শোনাত। কিংবা এসপস ফেবলস। মনগড়া রাজকুমারীর গল্পও। বাবার ছবি অস্পষ্ট হলেও, গল্পগুলোর স্মৃতি ফিরে আসছে। সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া অনুভূতিও। অবাক, খেতে খেতে শুনছে।

“পরাশক্তি আগুন থেকে টিন-এজেড ভার্জিন রূপে আবির্ভূত হয়। ভারতের সব থেকে দক্ষিণ প্রান্তে যায়। এভাবেই কন্যা (মেয়ে) আর কুমারী (ভার্জিন) শব্দটা আসে। এই মেয়েটি শিবের আশীর্বাদ নিয়ে বানাসুরকে ধ্বংস করে। কন্যাকুমারী টু দ্য লোকাল পপুলেস সিগনিফাইস ভার্জিনিটি অফ মাইন্ড, বডি অ্যান্ড সোল”

শ্রাবস্তি মনে করতে পারল না, ল্যান্ডস এন্ডের সঙ্গে, এরকম কোনও লিজেন্ড জড়িয়ে কি না। নো ওয়ান্ডার দিস কনট্রি হ্যাজ এ রিচ হেরিটেজ। মিথ হলেও, মিথ তৈরির সৃজনশীলতাকে অস্বীকার করা যায় না।

ছোটবেলায় স্কুল ফেরত, কেঁদে মাকে বলেছিল “ক্যান ইউ মেক দ্য কালার অফ মাই স্কিন হোয়াইট?”

রঞ্জিতা কথার পৃষ্ঠে অরিজিৎকে বললেও, ওর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। যে সভ্যতা একটা বাচ্চার মনে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে পারে, সে কোন সভ্যতা? দুনিয়ার শক্তিশালী সভ্যতা হলেও, সব থেকে প্রাচীন নয়। আমারা সবাই যদি অমৃতস্য পুত্র, তবে কেন এই ভেদ?

তখন ভালো করে বোঝেনি। এখন বুঝছে। কালো চামড়া নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। স্টিভ শুধু কালো চামড়াকেই গ্রহণ করতে চায়নি। চেয়েছিল বর্ণে, ছন্দে, রূপে, গন্ধে সম্পূর্ণতায় তার ইন্ডিয়ান। সে পারেনি স্টিভকে ইন্ডিয়ান রূপ দেখাতে। রাগ হল মায়ের ওপর। মায়ের জন্যই তো।

ফিরে তাকাল তিন সমুদ্রের তরঙ্গিত প্রবাহে। কিছুক্ষণ আগে দেখা বিবেকানন্দ মণ্ডপে বিবেকানন্দর আট ফুট ব্রোঞ্জ স্ট্যচু। সেই মহান পুরুষ, যাকে চেনাতে সুদূর কলকাতা থেকে বাবা তাকে এতদূর নিয়ে এসেছে। কী দেখাতে? সূর্যাস্ত আর পূর্ণিমার যুগলবন্দির মধ্যে বহুদিনের হারানো মেয়েকে শোনাতে চাইছে, জাগরণের গান।

অরিজিৎ বলে চলেছে “বলছিলাম না, বিবেকানন্দ দু-বছর ধরে সারা ইন্ডিয়া ঘোরেন। হি হ্যাড লিভড ইন সিথিং কলড্রন, ওয়াজ অ্যাফেক্টেড উইথ ফিভার, বাট হ্যাড ক্যারিড এ বার্নিং সোল অ্যামিডস্ট দ্য বান্ডেল অফ স্টর্ম। অল টু গিভ হিম এ রিয়েলাইজেশন”

“হোয়াট রিয়েলাইজেশন?” প্রাচুর্যে বড় হওয়ায় রিয়েলাইজেশনের মানে বোঝেনি। আজ মন এই মেটিরিয়ালিস্টিক সভ্যতার বাইরে সেই দর্শন খুঁজছে। দর্শনই বেঁচে থাকার একমাত্র সোপান। শ্রাবস্তি বাঁচতে এসেছে। কেউ বলেনি। অরিজিৎ আন্দাজ করেছিল।

“রিয়েলাইজেশন অফ ইন্ডিয়া হুইচ ওয়াজ লাইক গডেস দুর্গা। দ্য ডাউনফল অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস রেজারেকশন। অন দ্য পাস্ট, প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার অফ ইন্ডিয়া। সে অনুভব করেছিল, ইন্ডিয়ার সব থেকে বড় অ্যাসেট তার স্পিরিচুয়াল কনশাসনেস। এই স্পিরিচুয়ালিজম শুয়ে আছে তার অতিপ্রাচীন ধর্ম, সভ্যতার মধ্যে। সিটিং হিয়ার হি ক্যুড সি মাদার ইন্ডিয়া। এই রকে বসে দেখেছিল ভারতের মহান ইতিহাস। এত বছর সারা ভারত ঘোরা মনের চোখ খুলে দেয়। হি অলসো রিয়েলাইজড দ্যাট ওয়েস্ট ওয়াজ ল্যাকিং ইন স্পিরিচুয়ালিজম। যেটা ইন্ডিয়া দিতে পারে”

শ্রাবস্তি ইতিহাসের পাতা ছেড়ে হারিয়ে গেছে অনুভূতির আকাশে। এক না-দেখা সভ্যতাকে নতুন করে দেখা। এক না-চেনা পৃথিবীকে নতুন আঙ্গিকে চেনা। এক না-পাওয়া ঐতিহ্যের স্বাদ নতুন করে পাওয়া।

ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া!

বাবা কাঁধে আলতো করে হাত রেখে ওকে ঘুরিয়ে দিল। পেছনে সমুদ্র। চেয়ে আছে বিরাট ভূ-খণ্ডে। স্বামীজির ভারতকে লন্ডনের বঙ্গ-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, বিবেকানন্দ রকস থেকে দেখছে, এক নতুন রূপে। তার পিতৃ-মাতৃভূমিকে।

অরিজিৎ মেয়ের মাথায় হাত রেখে চোখ বুজে বলল "তৎত্বম অসি"

আবেগাপ্লুত শ্রাবস্তি ফিসফিস করে বলল "হোয়াট ডাস দ্যাট মিন?"

"ইউ আস্কড মি ইওর আইডেন্টিটি? তুমি এই বিশাল বিপুল সভ্যতার একটা অংশ। ইউ আর এ লিগ্যাসি অফ দিস হেরিটেজ। তোমার দেহের প্রতিটা অণু-পরমাণুর মধ্যে মিশে আছে এই ইন্ডিয়া। ইউ আর পার্ট অ্যান্ড সোল অফ দিস হিউজ হেরিটেজ অ্যান্ড সিভিলাইজেশন। দ্যাট ইজ ইওর আইডেন্টিটি। ইউ আর ইন্ডিয়া"

শ্রাবস্তির চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে মুক্তোর মতো শিশিরবিন্দু। কতদিন ভালো করে কাঁদেনি। আজ যেন বিবেকানন্দ রকসে দাঁড়িয়ে, তার না-চেনা ভারতবর্ষকে দেখছে। অনুভব করছে। উপলব্ধি করছে।

তার অস্তিত্ব নতুন আভরণে সাজছে।

****

"হোয়াই ডিড ইউ ডেসার্ট মি ড্যাড?"

প্রশ্নটা বারবার ঘুরে-ফিরে আসছে। শ্রাবস্তি এখনও উত্তর খুঁজে পায়নি। কন্যাকুমারী থেকে ফিরে আবার সেই প্রশ্ন। ভারতবর্ষে কিছু দেখা হয়েছে। নিজের আইডেন্টিটির ছেঁড়া তারের সুর, ভাসা ভাসা মেলডি তৈরি করছে। তবুও জন্মদাতার অবয়বটা ধোঁয়াশা। ভারতবর্ষের প্রক্ষাপটে, বাবা নিজেকে তুলে ধরতে চাইছে। বুলশিট। তার অরিজিন আর জন্মাধিকারে তার বাবা এক হতে পারে না। কী বলতে চাইছে? ড্যাড ইজ জাস্ট ইভেডিং দ্য পয়েন্ট।

"কাম অন, ইউ আর ইভেডিং দ্য কোয়েশ্চেন" শ্রাবস্তি সোফা ছেড়ে ডাইনিং ক্রকারি ক্যাবিনেটে হাত রাখল। থ্রি-কোয়ারটার সাদা কটন শর্টস, হাফ-হাতা হাল্কা-নীলে সাদা ফুল আঁকা টপস। ভারী ঠোঁট মুচকে, তীব্র শ্যেনদৃষ্টি "ইউ আর সেলফ সেন্টারড"

রঞ্জিতার শেখানো সত্য ওলটাবার ক্ষমতা কী অরিজিতের আছে? হয়ত আছে। না হলে এত বছর পর শ্রাবস্তি কেন আসবে?

কঠিন জেনেও বলল "হোয়াই আর ইউ গেটিং আপসেট? তুমি এসেছ সত্যি জানতে। সত্যিটাই বলব। ফর হেভেন্স সেক সিট ডাউন"

অরিজিৎকে ঠান্ডা দেখে খেপে উঠল শ্রাবস্তি। রেগে বলল "কাম অন ড্যাড। আই অ্যাম নো ফুল। ইউ আর ইভেডিং দ্য ইসু লাইক ইউ হ্যাভ অলোয়েজ ডান"

অরিজিৎ দৃঢ়ভাবে বলল "আই অ্যাম নট ট্রাইং টু ইভেড দ্য ইসু। যখন ইংল্যান্ড ছাড়ি তোমার বয়স আট। বোঝার বয়সই হয়নি"

শ্রাবস্তি শুনছে। অরিজিৎ বলে চলেছে "যদিও আমি ব্যারিস্টারি পাশ করি, ভারতীয় কালো চামড়া হিসেবে ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিস করতে পারতাম না। ইংল্যান্ডে থাকলে সলিসিটার হয়ে থাকতে হত"

শ্রাবস্তি থামিয়ে বলল "হোয়াই ডিডন্ট ইউ?"

"হোয়াই সুড আই? এনিথিং ওয়ার্স ইন ইন্ডিয়া?"

"ইউ লস্ট ইওর ফ্যামিলি" শ্রাবস্তির দ্বন্দ্ব। ফ্যামিলি না কেরিয়ার? কোনটা আগে?

"যদি তোমার মা ফেরত আসত, সব ঠিক থাকত। সি ডিডন্ট"

"হোয়াই?"

"তার কাছে সাকসেস, হ্যাপিনেস মানে ইংল্যান্ড। হোয়াটজ রং উইথ ইন্ডিয়া? অ্যান্ড হোয়াট ইজ সো বিউটিফুল অ্যাবাউট ইংল্যান্ড?"

"আই হ্যাভ বিন বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন ইংল্যান্ড। কান্ট থিংক অফ লিভিং এনিহোয়ার এলস"

"আই অ্যাম বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন ইন্ডিয়া। হাউ ড্যু ইউ এক্সপেক্ট মি টু লিভ লাইক এ কিং এনিহোয়ার এলস?" শ্রাবস্তির কথাটাই ফিরিয়ে দিল।

শ্রাবস্তি মুখে কথা নেই। কয়েক মুহূর্ত। ভুলে গেছিল বাবার প্রফেশন। কলকাতার এস্ট্যাবলিসড ব্যারিস্টার। আভরণের বাইরে বাবাকে খুঁজছে। যার বর্ণ তার অন্তরে। সামাজিক অলংকার মুক্ত মানুষটাকে। স্টিভকে কাছে পেয়েছিল ভালোবেসে। অরিজিৎকে বুঝতে চায় জীবনের তাগিদে।

অরিজিৎ থামল "মাইন্ড ইফ আই হ্যাভ এ ড্রিংক?"

"নট অ্যাট অল। গো আহেড"

বার ক্যবিনেটের দরজা খুলে বলল "অনেক ভালো ওয়াইন আছে। হোয়াট উড ইউ প্রেফার? অ্যান ইন্ডিয়ান ওয়াইন ফ্রম সোলান ওর স্যাটু রথচায়েল্ড? দুটোই আছে"

"লেটস ট্রাই দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ান প্লিজ। হোয়াট নেম ডিড ইউ সে?"

"সোলান। সিমলার কাছে ব্রুয়ারি। ভালো ওয়াইন তৈরি করে"

"হোয়াট ফ্লেভার? এপ্রিকট, রোস, গ্রেপ?"

শ্রাবস্তি আশ্চর্য হচ্ছে। ইন্ডিয়াতে এত ওয়াইন হয়? তার ধারনা ছিল ফ্রান্স, জার্মানি ছাড়া এত রকমের ওয়াইন কোথাও হয় না! ফ্রেঞ্চ ভিনিয়ার্ডের স্মৃতি এখনও ভাসছে। এতদিনে কিছুটা ইন্ডিয়ান হেরিটেজ দেখেছে। এখন দেখছে ইন্ডিয়ান ওয়ে অফ লিভিং। হোয়াই মাম হ্যাড টোল্ড হার 'ইন্ডিয়া ওয়াজ এ ডার্টি ন্যাস্টি প্লেস উইথ নো লাইফ' হোয়েন সি হারসেলফ ওয়াজ বর্ন হিয়ার?

সোলানের এপ্রিকট ওয়াইনে চুমুক দিয়ে বলল "মাম সেড ইউ ওয়ার নট প্রিপেয়ারড টু টেক আওয়ার রেসপনসিবিলিটি"

"কেন নেব না? ইউ আর মাই ওনলি ডটার"

গ্লেনমর‍্যাঙ্গিতে চুমুক দিয়ে অরিজিৎ বলল "কে তোমার পাবলিক স্কুল ফিস দিয়েছে? মাকে জিজ্ঞেস করেছ?"

"সি ডিড নট মেনশন" ডেভিডের কথা চেপে গেল। ডেভিডকে এনে সিচুয়েশন কমপ্লিকেটেড করতে চায় না। সোফায়, টেবল ল্যাম্পের আলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল "আই ফিল সো লস্ট। মাই ম্যারেজ হ্যাজ ব্রোকেন। আই অ্যাম অ্যান ইনকমপ্লিট লেডি"

"ইনকমপ্লিট! মাই ফুট। ড্যু ইউ নো দি মিনিং অফ ইনকমপ্লিটনেস?"

অরিজিৎ দৃঢ় কণ্ঠে, মমতা ভরা স্বরে বলল "তুমি কী মনে কর বিয়েটাই কমপ্লিটনেসের একমাত্র অবলম্বন? ডিভোর্সড হলে ইনকমপ্লিট হয়ে যাবে? ড্যু ইউ নো দি ইম্পর্ট্যান্স অফ বিইং আ ওম্যান? এতই সহজ। এটাই কী শিখেছ মায়ের কাছ থেকে?"

ক্রি...ই...ই...ই...ইং... যান্ত্রিক শব্দে চমকে উঠল। সিকিউরিটি বেল।

"গোবর্ধন, দেখ তো কে?"

কয়েক মিনিট। মঞ্জরী ঘরে ঢুকল। আশা করেনি এসময় মঞ্জরী আসবে। আগে বলেনি। মঞ্জরীকে দেখে আশ্চর্য। ভাবেনি, না জানিয়ে এভাবে হঠাৎ এসে পড়বে।

চটিটা দরজার সামনে খুলে বলল "হ্যাভ আই কাম অ্যাট দ্য রং টাইম?"

অবাক বিস্ময়ে শ্রাবস্তি চেয়ে আছে মঞ্জরীর দিকে। হু ইস সি? হঠাৎ এই সন্ধেবেলায় বাবার বাড়িতে কেন? ইস সি এ গার্লফ্রেন্ড অফ হার ড্যাড? ভেতরে তোলপাড় চলেছে। এই অপরিচিত মহিলার উপস্থিতি হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিল। বাবার সঙ্গে নিভৃতে বোঝাপড়া করতে চাইছিল। এখন ও আসায় সম্ভব নয়।

শ্রাবস্তির পাশের সোফায় বসে মঞ্জরী বলল "আই অ্যাম মঞ্জরী। ইউ আর শ্রাবস্তি" হাত বাড়াল "নাইস টু মিট ইউ"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় শ্রাবস্তি স্বভাবজাত ব্রিটিশ এটিকেটসে হাত বাড়িয়ে বলল "নাইস টু মিট ইউ টু"

শ্রাবস্তি আশা করছিল অরিজিৎ কিছু বলবে। কয়েক মুহূর্ত। সেই নীরব মুহূর্তে, দূরে ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ। বাবাকে কত কথা বলার আছে। এই অপরিচিত মহিলার সামনে বলা যাবে না।

মৌনতা ভেঙে শ্রাবস্তি বলল "ইউ হ্যাভ কাম টু মিট মাই ফাদার। হ্যভেন্ট ইউ?"

চেয়ে আছে সাদা-নীল ফুল আঁকা ঢাকাই শাড়ি পরা মঞ্জরীর দিকে। মধ্যবয়সি। সুন্দরী না হলেও মুখশ্রীর নিজস্ব মাধুর্য আছে। কে এই মহিলা? মম-এর বয়সি হবে। অথচ কত তফাত। প্রসাধন, আড়ম্বর নেই। হাল্কা লিপস্টিকের প্রলেপ। না খুঁজলে বোঝাও যায় না। মাকে একবারও প্রসাধনহীন অবস্থায় বেরোতে দেখেনি। কারও বাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা। পাশাপাশি দেখছে। অনাড়ম্বর মহিলাকে। আর কেন্টের জন্মদাত্রীকে।

মঞ্জরী শ্রাবস্তিকে বলল "নো। আই হ্যাভ কাম টু মিট বোথ অফ ইউ"

এবার শ্রাবস্তির অবাক হওয়ার পালা। ভ্রু কুঁচকে বলল "মি?"

"ইয়েস। ইউ আর লাইক মাই ডটার হুম আই লস্ট ইন এ ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট"

বিরক্তি থেকে বিস্ময়। জয়-জয়ন্তীর ঝালা মিশে গেল বেহাগের সুরে। দীর্ঘশ্বাস চেপে, স্বাভাবিক স্বরে বলল "মাই হাসব্যান্ড টু। তোমার সম্বন্ধে জানি। তোমার মা, আমি ক্লাসমেট ছিলাম। অ্যাকচুয়ালি স্কুল ব্যাচমেট"

এবার আরও অবাক হওয়ার পালা। মহিলা তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে। নিশ্চয়ই বাবা বলেছে। কেন? বাবার জীবনে ওর অস্তিত্ব ঘুরপাক খাচ্ছে। সে প্রশ্ন এখানে করা যাবে না। না-দেখা দেখাটাকে গিলে স্বভাবজাত ব্রিটিশ ভঙ্গিমায় বলল "সরি টু হিয়ার দ্যাট"

শ্রাবস্তির কথা টেনে মঞ্জরী বলল "ওয়েল, দ্যাটস লাইফ। আমি কিন্তু এখনও বেঁচে আছি। আশা নিয়ে নয়। স্টিল ট্রাইং টু ফ্যাদম দ্য ফ্র্যাগ্রেন্স অফ লাইফ"

মঞ্জরীর স্পষ্ট ইংরেজিতে শ্রাবস্তি অবাক। আরও অবাক ইংরেজি ভাষার সাবলীলতায়। কী বলবে, ভেবে পেল না। বাবার সঙ্গে হিসেব-বোঝাপড়া করার অনেক সময় আছে। এই মহিলা, তার কৌতূহল বাড়াচ্ছে। তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। মায়ের ছোটবেলার বন্ধু। বাবাকে তো জানেই। মাকেও। ভাবছিল অরিজিৎ ইন্ট্রোডিউস করে দেবে। অরিজিৎ সোফার কোনে বসে হুইস্কি খাচ্ছে। বাবার দিকে তাকাল। কিছু কথার আশায়। নীরব দেখে বলল "আই অ্যাম শ্রাবস্তি বসু"

"আই নো। ইউ আর অরিজিৎস ওনলি ডটার। অলরেডি টোল্ড ইউ আমার নাম মঞ্জরী। পদবির প্রয়োজন নেই। বিধবার পদবি দিয়ে কী হবে? আই অ্যাম মাই ওন আইডেন্টিটি"

'আই অ্যাম অ্যান ইনকমপ্লিট লেডি' কিছুক্ষণ আগেই বাবাকে বলছিল না শ্রাবস্তি? উত্তরের আগেই, মহিলা ঢুকে পড়ে। ওর মনের কথা না জেনেই, উত্তর নিয়ে হাজির।

তবুও ব্যঙ্গ করে বলল "অ্যান্ড মে আই নো, হোয়াট ইজ দ্যাট আইডেন্টিটি?"

"টু নো দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু নো মি। অ্যাজ আই অ্যাম" অরিজিৎকে বলল "উডন্ট ইউ সার্ভ মি সাম ওয়াইন?"

"অফ কোর্স" বার ক্যাবিনেট থেকে আরেকটা ওয়াইন গ্লাস বার করে এপ্রিকট ওয়াইনটা ঢেলে বলল "ফ্রম সোলান। শ্রাবস্তির চয়েস"

ওয়াইনে চুমুক দিয়ে মঞ্জরী বলল "ফর দ্য টাইম বিইং লেটস্ কিপ দ্য ইস্যু অ্যাসাইড। টেক মি অ্যাজ এ কমন ফ্রেন্ড অফ ইওর ড্যাড অ্যান্ড মাম"

কী বলতে চাইছে? মিসিং লিংক? একটা বন্ধন, যার ভিত্তিতে তার ভারতবর্ষে আসা। অনেক প্রশ্ন, যা তাকে তাড়া করে বেরিয়েছে এত বছর। হার প্রেসেন্ট ডাইন্যামিক স্টেট ইজ ইন এ নো ম্যানস ওয়ার্ল্ড। হার

প্রেসেন্ট আইডেন্টি হ্যাঙ্গিং ইন দ্য এয়ার বিটুইন টু কানট্রিস। এক যে দেশে বড় হয়েছে - শিক্ষা, বিয়ে, ডিভোর্স। আরেকটা যা দেখতে এসেছে।

বিবেকানন্দ রকসে তার মাথায় হাত রেখে, মুখটা ঘুরিয়ে, মাদার ইন্ডিয়াকে দেখিয়ে বাবা বলেছিল 'ইউ আর ইন্ডিয়া' যে দেশের নেটিভদের মতো তার গায়ের রং। সে দেশের এক ঝলক দেখেছে। সময় হয়েছে বিবেকানন্দ রকস থেকে ভারতবর্ষ দেখাকে নিবিড় করে বোঝার।

মঞ্জরী বলল "ইন্ডিয়া ইজ নট ওনলি এ হেরিটেজ। ইট ইজ অলসো এ সেন্স অফ বিলঙ্গিং। দ্য ওয়ারমথ, অ্যাফেকশন, কেয়ার, ইভেন টু এ ফরেনার লাইক ইউ"

কথায় পরোক্ষ শ্লেষ। বুঝলেও, শ্রাবস্তি অবহেলা করে বলল "হোয়াট ওয়ারমথ?"

ওয়াইনের গ্লাসটা টেবলে রেখে, শ্রাবস্তিকে আলিঙ্গন করে মঞ্জরী বলল "ইউ আর মাই ডটার"

প্রশ্নর উত্তরের আগে, হারানো ব্যথার গোপন নিভৃত কোণ থেকে, লুকিয়ে থাকা ফল্গুধারা বেরিয়ে আসছে। ভাসিয়ে দিতে চাইছে চার চোখের সঙ্গমকে। না-দেখা অনুভূতির মালা ধ্রুবতারা খুঁজছে। না-চেনা ধ্রুবতারা। ছোটবেলার কবিতাঃ

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার

হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর

দূরের তারাটা দূরেই থেকে গেছে। কাছে এসে ধরা দেয়নি। আজ বুঝি সেই তারা দু-হাত বাড়িয়ে ডাকছে। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে যাবে কোথায়? অন্য পথ যে নেই। কেরিয়ারিস্ট, স্ট্যাটাস খোঁজা মায়ের কাছে, মাতৃত্বের কর্তব্যে মঞ্জরীর উষ্ণ ছোঁয়ার অভাব ছিল। তাই কী স্টিভকে পেয়েও ধরে রাখতে পারেনি? সেই অভাব কী স্টিভও অনুভব করেছিল? অঙ্কের বাইরে অনুভূতির কম্পন। যা শিহরণ তুলে যুগ-যুগান্তরে প্রতিটা মানুষকে অলিখিত বন্ধনে বন্দি করে। এই নাম না-জানা বন্ধনের পরিচয় খুঁজতে শ্রাবস্তি এখানে? না কি, চেনা নাম, অথচ অচেনা মানুষটাকে নতুন করে চিনতে? মঞ্জরীর দিকে চেয়ে ওর নরম উষ্ণ হাত এক অলিখিত নিবিড় বন্ধনে বেঁধে ফেলছে। সম্পর্কহীন, পরিচয়হীন, ভাষাহীন নতুন স্পর্শের অনুরণনে।

মঞ্জরী শ্রাবস্তিকে বলল "দেয়ার ইজ লট টু নো, মাই ডিয়ার। দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়ং"

*****

আটপৌর শাড়ি পরা মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে শ্রাবস্তি বলল "হোয়াই ডিড ইউ ব্রিং মি হিয়ার?"

মঞ্জরী গঙ্গার দিকে তাকিয়ে "লং হোয়াইল ব্যাক মাই ডটার আস্কড মি এ ভেরি পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন ইন দ্য সেম সারাউন্ডিং"

শ্রাবস্তি মনে করতে পারল না, মাকে কখনও এই বেশে দেখেছে কি না। জিনস-টপস-সালোয়ারের বাইরেও আটপৌর শাড়ির একটা মাধুর্য আছে। না দেখলে বুঝত না। রাত জাগা করফুর সমুদ্রপারের বাইরেও যে শান্ত নিরবচ্ছিন্ন জায়গা থাকতে পারে, জানা ছিল না। এখানেই নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়, ডিজের উন্মাদনার মধ্যে নয়।

স্টিভ বলত "আই ডোন্ট লাইক দ্য নয়েজ"

"আই লাইক ইট" শ্রাবস্তির কথা মেনে নিত স্টিভ। মনে কী চলত, ও কি একবারও ভেবেছে? সি এনজয়েড পার্টি, ডিস্কো, হ্যঙ্গিং আউট, হার ওনলি ফর্ম অফ এন্টারটেনমেন্ট।

একা চলার অন্তরের মাধুর্য অনুভব করছে। বেলুড় মঠের নিস্তব্ধতায় শান্তির আমেজ। তার অন্তর এত বছর এটাই খুঁজছিল। মঞ্জরীও খুঁজছিল। গঙ্গার ওপারে মন্দিরে সন্ধের আরতির ঘণ্টা বাজছে। ঢং... ঢং... ঢং... আওয়াজ জলের উপরে ভাসছে। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে বাতাসে। প্রত্যেকের অন্তরের নিভৃতে। একেই ঠাকুর ওঁকারধ্বনি বলেছিলেন। সাকার নিরাকারকেও তো এভাবে বোঝানো যায়। ঘণ্টার ঢং শব্দের প্রথম ঢ-টা সাকার, আর অং-টা নিরাকার। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ওঙ্কারধ্বনির শব্দে আবেগাপ্লুত শ্রাবস্তির হাত থেকে ব্যাগটা পড়ে গেল। লক্ষ করেনি খোলা ছিল। একটা ছোট্ট টিনের কনটেনার ঘাসে লুটিয়ে পড়ল।

মঞ্জরী ওটা হাতে নিয়ে বলল "এটা কী?"

"এয়ারোসল গান। উই অলোয়েজ কিপ ইট উইথ আস টু প্রটেক্ট আওয়ারসেলভস। আফটার অল, দেয়ার আর মেনি ব্যাড মেন"

কনটেনারটা শ্রাবস্তির ব্যাগে ঢুকিয়ে বলল "ভালো। আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?"

"মানে?"

"এভরিথিং ইজ প্রিডেস্টিন্ড। স্লাইটলি ডিফারেন্ট ফ্রম ওয়েস্টার্ন ফিলসফি"

শ্রাবস্তি অবাক। এ দেশে মানুষের ঈশ্বরের ওপর এত বিশ্বাস। গায়ে কাঁটা দিল। গঙ্গার দিকে তাকাল। গোধূলির পড়ন্ত আলোয় বিষণ্ণ। ঘোলাটে জলে মিশেছে পড়ন্ত বেলার মন-খারাপ করা লালচে আলো। সেই আলোয় টুম্পাকে দেখছে, শ্রাবস্তির চোখে। তার সঙ্গে মিশেছে, সন্ধের কালচে রেশ। এখন ভাটা। কলকাতার দিকে জল বয়ে চলেছে। সঙ্গে বেশ কিছু কচুরিপানা। ফ্রি জয়-রাইড নিয়ে একটা পাখি কচুরিপানায় বসে। এতদূর থেকে মঞ্জরী পাখিটাকে চিনতে পারল না। মনে হল কাক। দূরে, দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে দুটো নৌকো ভেসে আসছে। অসামান্য ফটোগ্রাফের মতো সন্ধের পড়ন্ত আলোয় সিল্যুয়েট নৌকো দুটোকে অসাধারণ লাগছে। এপাড়ে বেশ ভিড়। বেলুড় টুরিস্ট স্পট। বিকেলে বহু লোক আসে। কেউ মন্দিরে আরতি দেখতে, কেউ ঠাকুর দেখতে, কেউ গঙ্গার পাড়ে সময় কাটাতে, কেউ প্রেম করতে, কেউ বা চুপ করে পাড়ে বসে ভাবতে। সাধারণ টুরিস্ট তো আছেই। শিকাগোর লেকচার বিশ্ববাসীকে টেনে আনে পলিউটেড কলকাতার নিরবচ্ছিন্ন শান্তির গহ্বরে।

পিছনে মন্দিরের দিকে মঞ্জরী তাকাল। জনসাধারণের ভীতি মেশানো ভক্তির উদ্রেকের জন্য, বিশাল মন্দিরটা যথেষ্ট গাম্ভীর্য বহন করে। যেন স্বামীজির বিশাল ব্যক্তিত্বের মূর্ত প্রকাশ। শ্রাবস্তিও ওদিকে চেয়েছিল। বিবেকানন্দ রকস থেকে বেলুড় মঠ। দুটো ভিন্ন জায়গা হলেও মানুষটা এক। যার সম্বন্ধে ড্যাড বলেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ। যে মাদার ইন্ডিয়াকে দেখেছিল ভারতবর্ষের শেষ ল্যাজ থেকে। মাথায় হাত রেখে বলেছিল

‘ইউ আর ইন্ডিয়া’। যেখানে বিবেকানন্দ শেষ, সেখানে শ্রাবস্তির শুরু। বাবা এক ঝলক ভূখণ্ড দেখিয়েছে। সময় হয়েছে দেশটাকে দেখার। মঞ্জরী একই লোকের আরেকটা পীঠস্থানে নিয়ে এসেছে। মাদার ইন্ডিয়াকে দেখাতে নয়। কী দেখাতে?

“হোয়াট ডিড ইওর ডটার আস্ক?”

“ইজ বিবেকানন্দ গড অর হিউম্যান?”

“অফ কোর্স হিউম্যান”

“লোকেরা তাকে ভগবানের মতো পুজো করে। দ্য সেম এজ ওল্ড কোয়েশ্চেন। ওয়াজ জিসাস গড অর হিউম্যান?”

“অফ কোর্স গড। হি ইজ দ্য ফাদার অফ খ্রিস্টানিটি”

“তাহলে ওর জন্ম থেকে আমাদের এই সাল গোনা কেন শুরু? গডস আর নট বর্ন?” মঞ্জরীর কথায় চমকে উঠল। আন্টি ইজ টকিং সেন্স। বি ইট ইস্ট অর ওয়েস্ট, দ্য স্টোরি ইজ দ্য সেম। ইফ দ্যাট বি সো, হোয়াই ওয়াজ সি রিবিউকড ওয়ান্স ফর দ্য কলার অফ হার স্কিন? এই ভেদাভেদ কী মানুষের তৈরি? দ্য স্টোরি অফ ভ্যালুস অ্যান্ড বিলিফস আর সেম এভরিহোয়ার। প্রত্যেকটা দেশে নিজ রূপে আত্মপ্রকাশ। ফর্ম পাল্টায়। সত্য নয়। আগে জানত। এখন বুঝতে পারছে।

মঞ্জরী শাড়িটা বুকে জড়িয়ে বলল “এখানে পুজো দিতে আসিনি। নতুন করে হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে খুঁজতে এসেছি। হোয়াট ব্রট ইউ টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইওর ড্যাড আফটার অল দিস ইয়ার্স?”

ঘাবড়ে গেল শ্রাবস্তি। হুট করে এমন ব্যক্তিগত প্রশ্নের সম্মুখীন হবে বুঝতে পারেনি। সে এসেছে অনেক প্রশ্ন নিয়ে। তার না-চেনা বাবাকে চিনতে। তার না-চেনা পিতৃমাতৃভূমিকে দেখতে। অন্ধকার শূন্যতায় পূর্ণতা খুঁজতে। এই মহিলা ব্যক্তিগত জায়গায় কেন প্রবেশ করতে চাইছে?

ওর মনের দো-টানা বুঝে মঞ্জরী বলল “হ্যাভ আই আস্কড ইউ সামথিং অকোয়ার্ড? যদিও তুমি আমায় চেন না ইওর প্যারেন্টস নো মি ওয়েল”

“ইউ স্টাডিড উইথ মাম?”

“একই স্কুলে। নো হার সিন্স চায়ল্ডহুড”

ইতস্তত করছিল। মায়ের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন। কাউকে জিজ্ঞেস করতে বা বলতে পারেনি। মাকে দেখেছে ব্রিটিশ পটভূমিতে। সময় হয়েছে, নতুন করে তাকে দেখার, ভারতীয় পটভূমিতে। দূরে ভাসা কচুরিপানার ওপর পাখিটার দিকে তাকিয়ে বলল “হাউ ওয়াস সি?”

“শুনতে চাও, দ্য ট্রুথ? অর ওয়ান অফ দোস ইউসুয়াল এক্সপ্রেশনস?”

দৃঢ়ভাবে শ্রাবস্তি বলল “দ্য ট্রুথ। নথিং বাট দ্য ট্রুথ” যেন কোর্টে শপথ নিচ্ছে।

“নো ডাউট সি ওয়াজ ট্যালেন্টেড। নাচ জানত। ওর মাও শিক্ষিত। বাট সামহোয়ার ডাউন দ্য লাইন দ্য নর্মাল এটিকেটস ওয়ার ল্যাকিং। আই মিন, সি ওয়াজ সিনিক্যাল অ্যান্ড ডিডন্ট মিক্স উইথ দ্য ক্রাউড”

“হোয়াই?”

“সি হ্যাড দিস উইয়ারড আইডিয়া সি ওয়াজ সুপিরিয়র দ্যান রেস্ট অফ আস। হুইচ আনফরচুনেটলি, সি ওয়াজন্ট। হয়ত মনের মধ্যে একটা ইনসিকিউরিটি। আমি অনেকবার তোমার মায়ের বাড়ি গেছি। ওর মা, মানে তোমার দিদিমা, তোমার গ্র্যান্ডপাকে স্লেভের মতো ট্রিট করত। হ্যাভ ইউ সিন ইওর গ্র্যান্ডপা?”

“নো। হি ডায়ড বিফোর আই ওয়াজ বর্ন”

বুঝতে পারছে মামের ডেভিডের সঙ্গে ব্যবহারের তাৎপর্য। শুধু ডেভিড নয়। ইট মাস্ট হ্যাভ বিইং এভরি মেল সি কেম অ্যাক্রস ইন হার লাইফ। মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় ড্যাডকে মাম স্কেল ছুড়ে মেরেছিল। এক কোণে শ্রাবস্তি ভয়ে শিউরে হেল্পলেসলি কাঁদত। বোঝার বয়েস হয়নি কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক। সেই রাগের আতঙ্ক অবচেতনে সারাজীবন তাড়া করেছে। কীসের ভয়? শূন্যতার ভয়। হারানোর ভয়।

স্টিভকে হারানোর পর প্রথম বুঝল, ভয়ের কিছু নেই। হারাবার আর বাকি কী? আজ সন্ধ্যারাগের সুরে শুনতে পাচ্ছে আরেক না-শোনা গান। সবাই হারাতে এসেছি। আর হারাবার কী আছে?

সন্ধে ঢলে পড়েছে। ওপাশে অনেকটা গির্জার আদলে গড়া রামকৃষ্ণদেবের মন্দির থেকে আওয়াজ আসছে ঢং... ঢং... ঢং... জাস্ট লাইক দ্য ডং অফ দ্য চার্চ বেলস অন এ সানডে মর্নিং। সুর এক। ভূমি আরেক। মন ভূমির ভেদাভেদ ভেদ নিজের ভেতরে ঢুকতে চাইছে। না চেনা, না জানা আরেক জীবনে। মঞ্জরী ওর ভেতরকে ছুঁতে পারছে। শ্রাবস্তির হাতটা হাতে টেনে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল "ইওর ড্যাড হ্যাজ গন থ্রু এ লট"

শ্রাবস্তিও মঞ্জরীর হাতে চাপ দিল "হোয়াই ডিড হি লিভ মি?"

"সে চায়নি। বাধ্যে হয়েছিল। বিকস ইওর মাম ডিডন্ট ওয়ান্ট টু কম্প্রমাইজ ফর এ কমপ্লিট ফ্যামিলি। আর ইউ ম্যারেড?"

"ডিভোর্সড"

হিন্দুর সিঁথির সিঁদুর জীবনসঙ্গীর পরিচয় দেয়। হাতের রিং দেখে ঠাওর করা মুশকিল মেয়েটি বিবাহিত কি না। হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর আবছা স্বপ্ন মঞ্জরীকে নাড়িয়ে দিল। কেউ চেয়েও পায় না। কেউ পেয়েও ধরে রাখতে পারে না। কী বিচিত্র এই জীবন।

শ্রাবস্তির হাতে নিজে চাপ দিল "প্রব্যাবলি ইউ রিয়েলাইজ হাউ ইম্পরট্যান্ট এ ফ্যামিলি ইজ। জানি না হোয়াই ইওর ম্যারেজ হ্যাজ ব্রোকেন। এ ব্রোকেন হোম ক্যান ওনলি গিভ আনাদার ব্রোকেন হোম"

ব্রোকেন হোম ক্যান ওনলি গিভ আনাদার ব্রোকেন হোম। চমকে উঠল শ্রাবস্তি। স্টিভকে হারানোর কারণটা বুঝছে। তার অস্তিত্বহীনতার মূল সুর। যে দেশে যে পৃথিবীতেই থাকি, কিছু অবলম্বন করে বাঁচতে চাই। না থাকলেও, থাকার অনুভূতি। মাম বলেছিল 'নেভার মাইন্ড। ইট হ্যাপেন্স ইন অল অফ আওয়ার লাইভস' ইফ দ্যাটজ ট্রু, হোয়াই ড্যু পিপল ম্যারি?

আন্টিকে বলল "এ সেন্স অফ বিলঙ্গিং ইজ দ্য এসেন্স অফ কমপ্লিটনেস"

"হু ইজ কমপ্লিট? ডোন্ট নো। প্রব্যাবলি নোবডি নোস"

শ্রাবস্তির মনে শব্দটা বারবার নাড়া দিচ্ছে কমপ্লিট। ওয়াজ সি ইনকমপ্লিট উইথ স্টিভ?

আচমকা মঞ্জরীকে প্রশ্ন "হোয়াট ইজ ইওর রিলেশনশিপ উইথ ড্যাড?"

চমকে উঠল মঞ্জরী। এভাবে প্রশ্নটা আসবে আশা করেনি। কয়েক মুহূর্ত। সামলে নিল। তীক্ষ্ণ পলকহীন দৃষ্টি "নাথিং। অর মে বি এভরিথিং। রিলেশনশিপ কান্ট বি ডেফাইন্ড অলওয়েজ। হোয়াট উই কল রিলেশনশিপ আর উইদিন দ্য রেলমস অফ নোন প্যারামিটার্স। ইটজ অ্যাকচুয়ালি এ সেন্স অফ বিলঙ্গিং, এ ফিলিং টুয়ার্ডস অ্যাচিভমেন্ট অফ কমপ্লিটনেস" চোখ দুটো জলে ভরে গেছে। টুম্পা অমিতের কথা মনে পড়ছে। একসঙ্গে বেরনো, রাতের টেবলে বসে খাওয়া, কত কিছু। যা আমরা গুরুত্ব দিই না। সেই গুরুত্বহীন জিনিসগুলো যখন জীবন থেকে হারিয়ে যায়, বুঝতে পারি তার মহাত্ম্য। মঞ্জরীর চোখের জল শ্রাবস্তির বুকে হিল্লোল তুলেছে। ছোট্ট জীবনে অনেক হারানোর কল্লোল। না-পাওয়ার কলতান। না-দেখার নিঃশব্দ ঝংকার।

সন্ধে ঢলে পড়েছে। গঙ্গার পাড় ধূসর আবছায়া অন্ধকার। দূরে ওপাশে টিমটিম করছে আলোগুলো। গঙ্গার এপাশ থেকে কলকাতাকে দেখছে। পেছনে দুটো মন্দিরের স্নিগ্ধ আলোয় চার্চ-বেলসের মতো কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ ভেতরে পবিত্রতার স্পর্শ আনছে। শব্দের পবিত্রতার মধ্যেই মনের পবিত্রতা।

ড্যাডের সঙ্গে সম্পর্ক যাই থাক না কেন, সি ইজ পিওর। সি ইজ মাদারলি। সি ক্যান ফিল দ্য রিদমস অফ হার হার্ট। আন্টির মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। আবছায়া সিল্যুটের দিকে তাকিয়ে বলল "ইওর টিয়ার্স স্পিক মেনি এ ওয়ার্ডস। ইউ আর এ মাদার, হুজ হার্ট ক্রায়েস ফর হার ডটার। সরি টু হ্যাভ আপসেট ইউ আন্টি"

চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছে মঞ্জরী বলল “আই অ্যাম ফাইন। জানি না তোমার বাবার জীবনে আমার অস্তিত্ব কী? দুজনেরই জীবন ইনকমপ্লিট”

দূরের তারাটা কাছে আসছে। ছোটবেলায় নিজের মনে আওড়ানোঃ

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার

হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট উই আর

তারাটা আর অন্ধকার আকাশে জ্বলজ্বল করছে না। নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। মাটির কাছাকাছি।

হাত বাড়াবার জন্য অপেক্ষায়... এখন শুধু ধরাটাই বাকি।

****

শীতের সকালে আড়মোড়া ভেঙে যখন শ্রাবস্তি উঠল, ড্যাড তখন কোর্টে। ব্রিটিশ সামারের মতো আবহাওয়া। এমন দিনে কেউ ঘরে বসে থাকে। যেখানে খুশি যেতে পারে। শপিং মল কিংবা কলকাতা ঘুরে দেখতে পারে। গাড়ি উইথ ড্রাইভার মজুত।

অলসভাবেই ডাকল “করবি, চা দেবে”

এখানে কত সহজ। হাঁক দিলেই হাজির। ইংল্যান্ড হলে নিজে চা-টাও গরম করতে হত। চায়ের কাপ হাতে, বারান্দার বেতের সোফায় বসে, শীতের মিষ্টি আমেজ উপভোগ করে ভাবছিল, কী করবে? মোবাইল বাজতেই ভাবল ড্যাড। কিন্তু না।

ও ইন্ডিয়ায় এসেছে রঞ্জিতা জানে না। জানলে তাণ্ডব শুরু হয়ে যেত। মাকে শুধু জানিয়ে এসেছে “আই নিড সাম স্পেস। গোয়িং টু ভিসিট এ ফিউ কান্ট্রিস”

“হুইচ কান্ট্রিস?”

“জার্মানি ইন দ্য ফার্স্ট ইন্সট্যান্স। দেন ডিসাইড” কথাটা এড়িয়ে গেছিল।

চাকুরে মেয়ে। স্বাধীনভাবে ঘুরবে। রঞ্জিতা বাধা দেওয়ার কে? দিলেই বা কেন শুনবে? ড্যাডের কাছে আসছে জানলে দিত না। ডাক্তার হলেও মা তাকে বাচ্চার মতো ট্রিট করে। কন্ট্রোলে রাখতে। কনট্রোলই প্রধান। ফিলিংস সেকেন্ডারি। ডিভোর্সের পর যদিও কিছুটা মেলো ডাউন করেছে। নেভার দ্য লেস...

ফোনটা তুলে বলল “ড্যাড”

“নট ইওর ড্যাড। আন্টি” মহিলা কণ্ঠস্বর।

“হায় আন্টি, হাউ আর ইউ?”

“ফাইন। আই অ্যাম অফ টুডে। ফিল লাইক গোয়িং আউট সামহোয়ার?”

“সিওর। আই ওয়াজ থিংকিং টু”

“গেট রেডি। আধঘণ্টার মধ্যে আসছি”

হাউ ডিফারেন্ট। আন্টি ক্যান ফিল হার। হার ওন মাদার কুডন্ট। না-জানা, না-চেনা সম্পর্ক বারবার চাওয়া-পাওয়ার গভীরে ধাক্কা মারছে। টেলিপ্যাথি! দ্যাটস হোয়াট দে কল ইট ইন ইংল্যান্ড। একটা বন্ধন। যার ভাষা নেই। তবুও তা রূপে, রসে, ছন্দে, গন্ধে আত্মপ্রকাশ করে নিজ মহিমায়। নাম না-জানা অনুভূতি। শূন্যতার মধ্যে একটু আশ্রয়। সেটাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ সলিচুড অফ ফুলফিলমেন্ট, ইন দ্য সোজার্ন অফ এক্সিসটেন্স। বাহিরের আমি ভেতরের আমিকে খুঁজছে।

হর্ন বাজতেই বুঝল, এ আর কেউ নয়, আন্টি। জানলায় মুখ বাড়িয়ে বলল “লেটস টেক ড্যাডস কার। দেয়ার ইজ এ ড্রাইভার”

“হোয়াই? ডোন্ট হ্যাভ ফেইথ ইন মাই ড্রাইভিং? হপ ইন। ইটজ ইউ অ্যান্ড মি টুডে। নো থার্ড পার্সন”

গাড়িতে উঠে শ্রাবস্তি বলল “ইওর শাড়ি লুকস গরজিয়াস। হোয়াটজ ইট কলড?”

মঞ্জরী সাদা খয়রি-পাড় কটকি শাড়ির দিকে তাকাল “তোমার পছন্দ? তুমি পরবে?”

শ্রাবস্তি অসহায়ভাবে বলল “আমি তো শাড়ি পরতে জানি না”

“আমি শিখিয়ে দেব”

কথাটা যে এভাবে ফলে যাবে বোঝেনি। সল্ট লেকের সিএ মার্কেটে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে মঞ্জরী বলল “এস”

“হোয়ার?”

আবরণী সকালে খদ্দের পায় না। দোকানদার শাড়ি সাজিয়ে মেলে ধরেছে।

"কোনটা পছন্দ?"

"আ... ন... টি..."

"কথা নয়। পছন্দ কর" বাধা দিল মঞ্জরী।

ঢাকাই, মটকা, কোটা। শ্রাবস্তির অস্বস্তি লাগছিল। ওর ছাপ দেখে মঞ্জরী বলল "ধরে নাও, আমি তোমার মা। কিংবা বাবা। মেয়েকে কিনে দিচ্ছি। না নিলে দুঃখ পাব"

কথা না বাড়িয়ে সিট বেল্ট লাগিয়ে বলল "হোয়ার আর উই গোয়িং?"

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে মঞ্জরীর জবাব "টু হেভেন অর হেল। ডস ইট মেক এ ডিফারেন্স? দ্য মোমেন্ট ইজ ইম্পরট্যান্ট। নট দ্য প্লেস"

"ইওর শাড়ি লুকস গরজিয়াস। শাড়িগুলো পরতে শিখিয়ে দেবে?"

স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে বলল "নিশ্চয়ই। বাঙালি হয়ে শাড়ি পড়বে না, তা কী হয়"

আন্টি ইস লুকিং ফ্যাবুলাস টুডে। নতুন বেশে। নতুন আভরণে। তার সমস্ত অস্তিত্বে নতুন রাগ। শ্রাবস্তিকে পাওয়ার আনন্দে?

নিবেদিতা সেতু দিয়ে গাড়ি ছুটছে। খুব খারাপ চালায় না মঞ্জরী। কলকাতার রাস্তায় শ্রাবস্তি গাড়ি চালাতে পারবে না। সো ক্রাউডেড। আন্টি ইজ অ্যাট ইজ। মনে পড়ল, প্যারিসের আর্ক ডি ট্রায়াম্ফে সাত বার ঘুরে শেষ অবধি লেনে ঢুকতে পেরেছিল। দিস ইজ অ্যাজ ব্যাড অ্যাজ প্যারিস। অ্যান্ড টক অ্যাবাউট রোম। কুডন্ট বি ওয়ার্সর। আন্টিকে ডিস্টার্ব করতে চায় না বলে, কথা বলল না।

আবছা স্মৃতি। এখন বিস্মৃতির অতলে। বাবা ড্রাইভ করছে। মা পাশের সিটে। পেছনে চিল্ড্রেন্স সিটে শ্রাবস্তি। উইকেন্ড ট্রিপ টু কান্ট্রিসাইডে। আবছা মিষ্টি অনুভূতির স্মৃতি। একটা ঘর। ছোট হলেও নিজস্ব। সম্পূর্ণতার আমেজ। সেই সম্পূর্ণতা আর এল না। আসবে কি না জানে না। তবুও না-পাওয়া অনুভূতিকে খুঁজে বেড়ানো। ছোটবেলার মেঘলা আকাশে তারা খোঁজার মতো। তারাটা কাছে এসেও ধরা দিচ্ছে না। তবুও ছোটবেলার মন তারাটাকে ছুঁতে চায়।

নিবেদিতা সেতুর ওপর, মঞ্জরী ডাইনে হাত বাড়িয়ে বলল "লুক অ্যাট দ্যাট টেম্পল। দক্ষিণেশ্বর মন্দির। রামকৃষ্ণদেবের পুজোর জায়গা। বাংলাতে বলি পীঠস্থান"

বার্কসায়ারে রামকৃষ্ণ মিশনে স্টিভের সঙ্গে দু-একবার গেছে। নামটা শোনা। কিন্তু সেখানে তেমন কিছু অনুভব করেনি। মনে হয়েছিল, ইংল্যান্ডের প্লেস অফ ইন্টারেস্টের মতো আরেকটা দেখার জায়গা।

শ্রাবস্তি ওদিকে তাকিয়ে বলল "আমরা কী ওখানে যাচ্ছি?"

চমকে উঠল মঞ্জরী ওর আধো বাংলায়। শ্রাবস্তি বাংলা বলার চেষ্টা করছে।

"না" এক অজ্ঞাত যাত্রায় নিয়ে যেতে চায়।

আপত্তি নেই। হারিয়ে আবার হারতেই তো সে ইংল্যান্ড থেকে বেরিয়ে পড়েছে। শোনা অথচ অজানা পৃথিবীর সন্ধানে। এই হারানোর মধ্যে যদি কিছু খুঁজে পাওয়া যায়, ক্ষতি কী? জলবেষ্টিত দ্বীপের আবদ্ধতায় জীবনকে দেখেছে। এই আবদ্ধতাই ব্রিটিশদের ইইসি থেকে আলাদা করে দিয়েছে সুপিরিয়রিটির মোহে। দে হ্যাভ মেন্টালি নট ইভলভ ফর্ম দেয়ার আইল্যান্ড মাইন্ডসেট। তার রেশ শ্রাবস্তি বুঝতে পারেনি। এটুকুর মধ্যেই খুঁজে পাচ্ছে আরেক পৃথিবীর রস।

সেই সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছে। পেটে ছুঁচো ডন মারছে। আন্টিকে বলল "আমার খিদে পেয়েছে"

খিদে মানে রেস্তরাঁ। ইংল্যান্ডের মতো এখানে মোটরসাইড ট্র্যাভেল লজ নেই। অগত্যা মোটামুটি ছিমছাম হোটেল। মিনারেল ওয়াটারের বোতল বগলে গুঁজে বলল "আই অ্যাম সেপটিক্যাল অ্যাবাউট দ্য ওয়াটার"

"ইন্টারন্যাশনল স্ট্যাটিসটিক্স অনুযায়ী ইউকের জল বেশি পলিউটেড বিকস অফ কেমিক্যাল ওয়েস্টস। তুমি যখন অভ্যস্ত নও, বেটার ক্যারি দ্য মিনারাল ওয়াটার"

ওয়ান্টান সুপ অ্যান্ড গার্লিক চিকেন দুটোই সুস্বাদু। খাওয়া শেষে শ্রাবস্তি জিজ্ঞেস করল “হোয়ার ইজ দ্য ল্যু?”

বেয়ারা বোঝেনি। মঞ্জরী বাংলা করে জিজ্ঞেস করল “বাথরুমটা কোথায়?”

দেখিয়ে দিল। রেস্তোরাঁর বাইরে। শ্রাবস্তি চলে গেল। টুম্পাকে নিয়ে কতদিন এভাবে এখানে-ওখানে খেতে চলে গেছে। অমিতের সময় ছিল না, মেয়ের বায়না-আবদারের দিকে চোখ ফেরাবার। খাওয়াটা আসল নয়। এই ছোট ছোট অভিব্যক্তিতে মেয়ের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল নিবিড় বন্ধন। তার রেশ আজও তাড়া করে বেড়ায় অবচেতনে। সেখানেই খুঁজে পায় অরিজিতের না-গাওয়া রাগ। সুর এক। পুরনো পাওয়ার স্মৃতি, এখন শূন্যতার গীতি। বাকি জীবনের গতি। বেহাগের সুরের মূর্ছনা মালকোষের মধ্যে সূর্যোদয়ের প্রথম দ্যুতি।

“হেল্প! হেল্প! হেল্প! আ... ন... টি...”

শ্রাবস্তির গলা না? চেয়ার ছেড়ে ছুট দিল বাথরুমের দিকে। পাশাপাশি দুটো বাথরুম। ছেলেদের ও মেয়েদের। একদল যুবক শ্রাবস্তিকে ঘিরে। তার মাঝ থেকে শ্রাবস্তির করুণ আর্তনাদ। ওদের ঠেলে, শ্রাবস্তিকে জড়িয়ে বলল “কী হয়েছে?”

ভয় কান্না মেশানো গলায় শ্রাবস্তি বলল “দে ওয়ার ট্রাইং টু মলেস্ট মি”

কোনও কথা নয়। ওদের মধ্যে একজন নেতা গোছের, সামনে দাঁড়িয়ে। চটি খুলে সপাটে মারল গালে। রাগে সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে। যা হয় হোক। ভাবার সময় নেই। ওদের দিকে তাকিয়ে “লজ্জা করে না তোদের? বাচ্চা মেয়ের পেছনে লাগতে? দেখি কোথায় কে মরদের বাচ্চা। কচুকাটা করে ছাড়ব”

মধ্যবয়সি মহিলার দেমাক দেখে ঘাবড়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত। তারপর স্বাভাবিক পুরুষালি ঢঙে ওই নেতা খেঁচিয়ে উঠল “বেশি রং বেড়েছে। দেখে নে তো শালিকে”

কথা শেষ হওয়ার আগে, ওর অন্ডকোষে হাটু দিয়ে লাথি “দেখি, কে দেখবে! সাহস তো কম নয়। আমার মেয়েকে ছিঁড়তে এসেছিস”

শ্রাবস্তি এক কোণে দাঁড়িয়ে আন্টির ‘রণং দেহি’ মূর্তি দেখছে। মঞ্জরীর অন্য এক মূর্তি। দুর্গা নয়। কালীমূর্তি। দক্ষযজ্ঞে নেমেছে। কিছুই পরোয়া করে না। শ্রাবস্তির ভয়ে কাঁপছে। ইফ সি কুড ডু এনিথিং, সি উড। বাট সি হ্যাজ নেভার ফেসড সাচ এ সিচুয়েশন বিফোর। নিউ ইয়র্কের ব্রংকসে একজন রিভলভার উচিয়ে টাকা চেয়েছিল। বিনা বাক্যব্যায়ে ২০ ডলার দিয়ে দিয়েছিল। নিগ্রো ছেলেটা ডলার নিয়ে কেটে পড়েছিল।

গুরুকে মার খেতে দেখে, কয়েকজনকে এগিয়ে আসতে দেখে, মঞ্জরী ছুটে গেল শ্রাবস্তির দিকে। ওর হাত থেকে ব্যাগের ঝিপ খুলে এয়ারোসল গানটা ওদের মুখে স্প্রে করল। মুহূর্তে জ্বলে উঠল চোখগুলো। মুখের রং পাল্টে গেল। বুঝতে পারেনি কী হচ্ছে। নির্ভয়ে মঞ্জরী ছেলেটার সামনে গিয়ে বলল “আর লাগবি আমার মেয়ের সঙ্গে?”

অবাক মস্তানের দল মঞ্জরীর মাতৃরূপকে ভয় পেতে শুরু করেছে। দেবি যখন তাণ্ডবে মেতেছে, রুখবে কে? কিছুরই পরোয়া করে না। ততক্ষণে নাটক-চিৎকারে ভিড় জমতে শুরু করেছে। গুরু বুঝতে পারছে, ওরা কোণঠাসা। নীচটা ব্যথায় জ্বলছে। অন্যদের চোখগুলোও। কী স্প্রে করল? বাপের জন্মে দেখেনি।

নিজেকে গুটিয়ে বলল “চল চল, একদিন শালিকে দেখে নেব। আমার নাম কেষ্ট পোদ্দার। এ তল্লাটে সবাই আমায় এক নামে চেনে।... তোকে ছেড়ে দেব না। দেখি শালা কে তোকে বাঁচায়? কেষ্ট পোদ্দারের নামে এ তল্লাটে বাঘে-গরুতে জল খায়। জিজ্ঞেস করে নিস”

একসঙ্গে বেড়িয়ে গেল।

জবাব না দিয়ে, শ্রাবস্তিকে জড়িয়ে রেস্টুরেন্টের দিকে এগোল “ডোন্ট ওয়ারি। ইউ আর ফাইন। অ্যাজ লং অ্যাজ আই অ্যাম হিয়ার, নো বডি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যান টচ ইউ”

ভিড়ের মধ্যে থেকে নানান প্রশ্ন "কী হয়েছিল দিদি?" "আপনি ঠিক আছেন তো?" "জানেন ওরা এ-পাড়ার দাপটে মস্তান" "ওদের সঙ্গে না লাগলেই ভালো করতেন"

মঞ্জরী ওদের কথার জবাব না দিয়ে, বেয়ারার দিকে টাকা ছুড়ে, চেঞ্জের অপেক্ষা না করে, গাড়ির ড্রাইভিং সিটে। পাশে শ্রাবস্তি। হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে নতুন করে বুকে আগলে নিয়েছে।

****

আস্তে আস্তে আকাশের আলো কমে যাচ্ছে। একটা দুটো করে তারা ফুটে উঠছে আকাশের ক্যানভাসে। গঙ্গার জল ধীরে ধীরে কালচে হয়ে যাচ্ছে। দূরে দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে একটা নৌকো পাল তুলে ভেসে আসছিল। সেটা ক্রমশ জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। রাতের আঁচল আস্তে আস্তে হাওয়ায় টানে ছড়িয়ে পড়ছে। ধীর পায়ে সন্ধ্যা নামছে। ক্লান্ত অবসন্নতার শিথিল আচ্ছাদন বিছিয়ে। আকাশের এঘর, ওঘর, সেঘরের দরজা খুলে সব ঘরেই একটা একটা করে মৃদু তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

শ্রাবস্তি মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। ইংল্যান্ডে এমন করে সন্ধ্যা আসে না। অন্তত সে যেখানে থাকে, সেখানে নয়। শ্রাবস্তির মনে হল, এই সন্ধ্যার সঙ্গে মায়ের কোথায় যেন একটা মিল আছে। সারাদিন হুটোপাটি করে বাচ্চারা শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় ঘরে ফিরছে। মা তাদের আসার পথ চেয়ে ঘরে ঘরে দিয়া জ্বালিয়ে রাখছে। কখন ওরা এসে মায়ের কোলে লুটোপুটি খাবে। হঠাৎ ওর মনে হল, সন্ধ্যার আঁধার যেন মায়ের ঘন কালো চুল। মনে পড়ল, আগে ওর মায়েরও লম্বা চুল ছিল। হঠাৎ কী যে হল। বোধহয় সাহেবদের দেখে, দুম করে একদিন কেটে ফেলল। মায়ের কথা মনে পড়তেই, ওর মনে একটা অদ্ভুত আবেগের সৃষ্টি হল। অভিমান, রাগ, দুঃখ, হতাশা মিলে ভীষণ মনখারাপ করা অবস্থা।

আড়চোখে পাশে বসা মঞ্জরীর দিকে তাকাল। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মঞ্জরীর মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। চুলগুলো হালকা হাওয়ায় উড়ছে। সামনে গঙ্গার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্থির বসে। শ্রাবস্তির হঠাৎ মনে হল, মঞ্জরী আর সন্ধ্যা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তার দুচোখ হঠাৎই ভীষণ জ্বালা করে উঠল। চোখে জল এসে গেল। অব্যক্ত ব্যথায় ইচ্ছে হল মরে যেতে। পাশ ফিরে মঞ্জরীর দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। জল ভরা চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টিতে, আধো অন্ধকারে ওর মনে হল, মঞ্জরীর শরীরটা যেন অন্ধকারের সঙ্গে গলে গলে মিশে যাচ্ছে।

গোধূলির শেষ রশ্মি তখন গঙ্গার ওপর বিদায়বেলার শেষ আলোর আভা ছড়িয়ে ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। রাগ ভূপালির শেষ রেশটা টেনে দিচ্ছে অস্তগামী সূর্যের নিঃশেষ হয়ে যাওয়া আলোর দিগন্তে। বর্ণহীন অন্ধকার সেজে উঠছে নতুন বর্ণের আভরণে। কালো শাড়িতে ঢাকা ঘোমটা তোলা বধূ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে থমকে গেছে। ওপাশের দাওয়ায় শিশুটির কান্না তুলসীতলার প্রাঙ্গণ থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছে উঠোনের আঙিনায়।

সেই কান্না মঠের সন্ধ্যারতির কাসরঘণ্টার থেকেও মনকে বেশি করে নাড়া দেয়। এ তো ছোট্ট অবলা শিশুর করুণ মিনতিতে তার মাকে কাছে পাওয়ার ডাক। এখানেই রয়েছে জীবনের আসল সন্ধ্যারতি। পূজার নৈবেদ্যে নয়। কোথায় মিলেমিশে গেছে না-শোনা অন্তরের ঝংকারে। সেই ঝংকার শুনিয়ে যাচ্ছে, না দেওয়া পূজার মন্ত্রঃ

বরণ করি আমি তোমায়
আমার নিজের না পাওয়া
প্রদীপের পেছনে পড়ে থাকা
একান্ত নিভৃত অন্ধকারে।
তোমায় আমি গ্রহণ করি
আমার শেষ রাগিনীর
একাকী নিঃশব্দ ঝংকারে।
তুমি যেই হও না কেন তুমিই তো আমার পূজা।
তুমি যেই হও না কেন তুমিই আমার রাজা।
তুমি যেই হও না কেন তুমিই তো আমার তৃষা।

শ্রাবস্তি চলতে চলতে আজকের মঞ্জরীকে দেখে হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়েছে। রঞ্জিতা জন্মদাত্রী মা। মঞ্জরী জন্মদাত্রী না হলেও, আরেক মা। শ্রাবস্তি এসেছে বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। তার আগেই পেয়ে গেল আরেক ছন্দ। মাতৃত্বের রূপ, রস, গন্ধের অন্য আনন্দ।

ঢলে পড়া সন্ধ্যার অন্ধকারে চেয়ে, আবছায়া সিল্যুট মঞ্জরী জীবন্ত অন্য রঙে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া ক্ষণ। না-পাওয়ার শুভ আলোড়ন। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল অশরীরী মঞ্জরীকে। তখনই মঞ্জরী ফিরে বলল "কী হয়েছে?"

"হোয়াই ডিড ইউ টেক দ্যাট রিস্ক ফর মি?"

"রিস্কস আর রেলেটিভ। ইউ আর দ্য সিওরিটি অফ মাই লাইফ"

কী বলছে আন্টি! শ্রাবস্তির গুলিয়ে যাচ্ছে। মাথা কাজ না করলেও, মন করছে। অনেক দিনের, না-পাওয়া স্বপ্ন ধরা দিচ্ছেঃ

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার

হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর

মঞ্জরী তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল "তুমি কী ওই তারাদের নাম জানো?"

"না"

"অনেক নাম আছে। বাংলায় নাম দিয়েছি স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, অরুন্ধতী। সব মিলিয়ে সাতাশটা। কিন্তু দিক খোঁজার জন্য আমরা খুঁজে বেড়াই একটাই তারা। ধ্রুবতারা। ইংরেজিতে দ্য নর্থ স্টার"

ছোটবেলার শোনা রাইমটা পাশে নেমে এসেছে, জানা বা অজানা কোনও এক তারা হয়ে। যাকে এতদিন খুঁজছিল। নাম যাই হোক না কেন। সেই তো তার অবলম্বন। তার নর্থ স্টার! বেঁচে থাকার ধ্রুবতারা।

দ্য সঙ অফ হার লাইফ।

দ্য রিদম অফ হার ডিসায়ার্স।

দ্য সোলেস অফ হার মেলাঙ্কলি।

স্টিভ নয়। মামও নয়। ইট ইজ হার আন্টি। হু হ্যাজ ফিলিংস ফর হার। সি হ্যাড সিন দ্যাট হোয়েন দ্য বয়েস ওয়ার ট্রাইং টু মলেস্ট হার।

ঠাকুরের বিশাল মন্দিরের পাশে মায়ের মন্দির। আকারে ছোটই। এরও বিশেষত্ব আছে। হিন্দু মন্দিরগুলো সাধারণত দক্ষিণ বা পশ্চিমমুখি হয়। মায়ের মন্দিরটি নিয়মের বাইরে। পূর্বমুখি। মা গঙ্গা দেখছেন অপলক দৃষ্টিতে। মায়ের গঙ্গা খুব প্রিয় ছিল। তাই মন্দিরটি নিয়ম ভেঙে ওই ভাবেই তৈরি। ছোট্ট শান্ত মন্দিরটিতে জাঁকজমক নেই। মা সবার মা। মা শান্তভাবে বসে সন্তানদের জন্য অপেক্ষা করছেন। মনটা জুড়িয়ে গেল। চুপ করে বসে দুচোখ বুজতেই, ভেসে উঠল মায়ের শান্ত স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি। ভেতরে কে যেন ডেকে উঠল 'আমি সবারই মা। সত্যিকারের মা'

পেছনে কুলকুল করে বয়ে চলেছে ভারতবর্ষের প্রাণদায়িনী সুরধুনী গঙ্গা। সামনের ঠাকুরের মন্দির থেকে ভেসে আসছে, মনপ্রাণ ভরিয়ে দেওয়া গুরুগম্ভীর স্তোত্র খণ্ডন ভব বন্ধন। মানে বুঝতে পারছে না। তবু সেই স্তোত্র ভেতরে ওঙ্কারধ্বনি তুলছে। এরকমই কী ছিল প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের আশ্রম? ওই ওঙ্কারধ্বনিতে রঞ্জিতার সুর শুনতে পারছে না। অন্য মায়ের সুর। কে সে? ঝাপসা ছবিটা আকার নিচ্ছে, একটা পার্থিব অবয়ব। কোটা শাড়ি পড়া অস্পষ্ট সিল্যুট দেখছে। আর কে? সেখানে একজনই বসে। তার আন্টি।

সেই স্তোত্রের ফাঁকে, পেছনে মঠের থেকে ভেসে আসছে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ। ঢং... ঢং... ঢং... শ্রাবস্তির মনে পড়ল চার্চে স্টিভের সঙ্গে বিয়ে

ইন রিচনেস অর ইন হেলথ

ইন সিকনেস অর ইন পর্ভাটি

আন্টিল ডেথ ড্যু আস অ্যাপার্ট

সামাজিক শেখানো প্রহসনগুলো বুকে থাপ্পড় মারছে। সি ইজ ইওর মাম, জি ইজ ইওর ড্যাড, হি ইজ ইওর ল্যফুলি ওয়েডেড হাসব্যান্ড।

কোথায় রঞ্জিতা? কোথায় মঞ্জরী? একজন জন্মদাত্রী। আরেকজন জীবনদায়িনী। একজন সমাজের ঘেরাটোপে বন্দি। অন্যজন অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধতে চাইছে। বন্ধনহীন বাহুডোরে। মঞ্জরীকে জিজ্ঞেস করল "ড্যু ইউ বিলিভ ইন দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ম্যারেজ?"

চমকে উঠল মঞ্জরী। কী বলতে চাইছে? ঘুরিয়ে বলল "এভরি রিলিজন, কালচার, সিভিলাইজেশন হ্যাজ সেট আপ সার্টেন নর্মস্ টু লিভ ইন সোসাইটি। যদি তুমি আমার মতামত জানতে চাও, আমি বলব, আই রেসপেক্ট অল দ্য নর্মস। বাট আউটসাইড দ্য প্যারাডাইমস অফ দিজ নর্মস, রামকৃষ্ণস ওয়াইফ সারদাদেবী টট আস দ্য ইউনিভার্সাল ভ্যলুস অফ মাদারহুড"

"হোয়াট ডস দ্যাট মিন?"

"তাঁর নিজের কোনও সন্তান ছিল না। পৃথিবীর সবাইকে নিজের সন্তানের মতো দেখতেন"

শ্রাবন্তির মনে হল, মঞ্জরী কিছু বোঝাতে চাইছে। বাজিয়ে দেখার জন্য বলল "ড্যু ইউ মিস ইওর ডটার?"

"আগে করতাম। এখন আর করি না। ভেবে কী হবে? পেছন ফিরে ভেবে লাভ নেই। যা অতীত তা ফিরে আসবে না। বিশেষ করে আমার সামনে যখন একটা সুইট প্রেজেন্ট"

রাগ ভুপালির ঝালার তরঙ্গ শ্রাবন্তির অন্তরে। এখন আর মঞ্জরী আরেক মহিলা নয় - সারদা মায়ের মতো, আরেক মা। সারা পৃথিবীর মাতৃত্ব ওর মধ্যে লুকিয়ে কি না, জানে না। নিজের অগোচরে কোথায় স্থান করে নিয়েছে জন্মদাত্রী মায়ের ছোটবেলার বন্ধু।

আজ সে বেলুড় মঠে বেড়াতেই আসেনি। এসেছে তার হারিয়ে যাওয়া সত্তাকে নতুন আভরণে সাজাতে। সন্ধের কাঁসরঘণ্টা বুঝি সেই বরণের গীত গাইছে। তার অন্তরের দেবীকে বোধন করতে, নাম না-জানা নতুন ছন্দে।

দুচোখ জলে ভরে গেছে। কী খুঁজতে এসেছিল? আর কী পেল? কথাটা বোধহয় ঠিক। ইউ লুজ সামহোয়ার, ইউ উইন এলসহোয়ার। চাওয়া-পাওয়াটা গুলিয়ে ভেতর থেকে অস্ফুট কান্নার ঝালা হয়ে আছড়ে পড়ছে। সেই কান্না দুঃখের নয়। পূর্ণতার।

মঞ্জরীকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল " মা... ম"

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না মঞ্জরী। চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়ছে। চাপা মাতৃত্ব ভাষাহীন চোখের জলের প্লাবনে আছড়ে পড়ছে। সে কোনওদিনই বিশ্বাস করেনি টুম্পা নেই। আজ ঈশ্বর, বহুদিনের হারানো টুম্পাকে নতুন রূপে তার কোলে নিয়ে এসেছে। নতুন প্রতিমার জীবন্ত কায়ায়। মায়া-কায়া মিলেমিশে একাকার, অশ্রুনদীর শেষ ঝালার ঐকতানে।

শ্রাবন্তিকে বুকে টেনে বলল "মাই সুইট বিউটিফুল ডটার"

ভাষা থেমে গেলেও হৃদস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর। একটা সুর মনের গভীরে আলোড়ন তুলছে। কী সেই সুর? ওরা জানে না। শুধু জানে, সেই উদাসী সুর মনের কোথাও ছন্দ ছাড়াচ্ছে। দেশ, কাল, স্থান, সময়, সম্পর্কের বেড়াজালের বাইরে অনুভূতির অভ্যুদয়। অন্তরের শব্দহীন বাণীর অন্য মূর্ছনা। সব হারানোর মধ্যেও নতুন করে পাওয়ার অনুক্ষণ। নব-জীবনে নতুন জাগরণ।

****

কম্পিউটারের সামনে বসে সামনের সপ্তাহের ব্রিফটা রেডি করবে বলে ম্যাকবুক-প্রো খুলে বসেছিল অরিজিৎ। মন বসছিল না। মনটা এখানে-ওখানে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সাত-সমুদ্র তেরো নদীর পাড় থেকে সল্ট লেকের বাড়ির শ্রাবন্তির চারধারে। মানুষটা এক। কিন্তু এই সতেরো বছরে কত পাল্টে গেছে। ছোট্ট শ্রাবন্তি

আজ বড় হয়ে গেছে। এখন রাতে বায়না ধরে না। ফিডিং বটল হাতে সারা-রাত বসে থাকতে হয় না। এখন তাকে ইসপস ফেবলস পড়ে শোনাতে হয় না। এখন জীবনের ফেবল শুনতে চায়। অরিজিতের কিছু বলার নেই। জীবনের ফেবল কী কেউ শেখাতে পারে? শুধু দেখাতে পারে।

ফাইলটা খুলতে পেছন থেকে ভেসে এল শ্রাবস্তির গলা "ড্যাড, আর ইউ বিজি?"

"নট অ্যাট অল" ঘুরে দেখল শ্রাবস্তি দাঁড়িয়ে। হালকা খয়েরি হাফ-প্যান্ট, সাদা টপস। প্রসাধনহীন শ্রাবস্তি যেন বাড়িরই একজন। বিদেশিনি নয়। তার হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট মেয়েটি "ভেতরে এস। তোমার জন্য কফি করে আনি" অরিজিৎ উঠে পড়ল।

অরিজিৎকে বেরতে দেখে শ্রাবস্তি বলল "দেয়ার আর প্লেন্টি অফ পিপল অ্যাট হোম। হোয়াই ইউ?"

"ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড" কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

শ্রাবস্তি স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসে কম্পিউটারের ডকুমেন্টসগুলো দেখছিল। চোখ পড়ল 'শ্রাবস্তি' নামের ফোল্ডারে। স্বাভাবিক কৌতূহলে, ক্লিক করতেই ফাইলগুলো দেখতে পেল। অসংখ্য ছোটবেলার ছবি। খুলে দেখছে। জন্মের সময়কার, বাবা ফিডিং বটল হাতে, বাবার কোলে আকাশে তুলে খেলছে। এত কম চুল ছিল সেই বয়সে? নাউ সি হ্যাজ টু ট্রিম হার হেয়ার এভরি থ্রি মান্থস। অস্পষ্ট পুরোনো স্মৃতি ফিরে আসছে। বুকের ভেতর নাড়াচাড়া। ছুঁতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। সেসব অস্পষ্ট স্মৃতির মধ্যে ছবি - মেমরিজ অফ হ্যাপিনেস অ্যান্ড ফুলফিলমেন্ট।

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল খুলতেই চোখের সামনে শ্রাবস্তিকে লেখা চিঠি।

৭ জানুয়ারি ১৯৯৪। তার দশম জন্মদিন। তাকে লেখা বাবার চিঠি। লেখাই হয়েছে। সে পায়নি। পড়তে লাগল বাবা কী লিখেছিল।

"মাই লাভিং শ্রাবস্তি। অন দিস ডে ইউ আর টেন ইয়ার্স ওল্ড। ইউ মাইট হ্যাভ ফরগটেন মি। বাট আই কান্ট টেক মাই আইস অফ ইউ। স্টিল ইউ আর পার্ট অফ মাই বিইং। এ ফিউ মান্থস ব্যাক আই ওয়াজ হ্যাভিং ডিনার অ্যালোন অ্যাট দ্য রেস্তোরাঁ ট্যানজারিনস। ড্রেডফুলি মিসিং ইউ। ইট রিমাইন্ডেড মি অফ দ্য ডিনার উই হ্যাড অ্যাট আন্টালিয়া ইন নটিংহ্যাম" ঝাপসা মনে পড়ছে সেই উইকেন্ডের কথা। খাবার কথা নয়, মায়ের কথাও নয়। সেদিনের সেন্স অফ টুগেদারনেস। তার একটা পৃথিবী ছিল। সে হারিয়েছে। পড়ে যাচ্ছে "লাস্ট উইক আই ওয়েন্ট টু আরাবারি, এ ফরেস্ট বাংলো ইন ওয়েস্ট মেদিনীপুর। ইট রিমাইন্ডেড মি অফ দ্য ডেইস উই স্পেন্ট ইন ব্ল্যাক ফরেস্ট। হোয়েন ইউ ক্যুড জাস্ট অ্যাবাউট ওয়াক"

সে স্মৃতিও মনে নেই। কিন্তু ড্যাড আজও সে স্মৃতি আঁকড়ে বসে। ড্যাড ওয়াস জাস্ট নট এ নেম। একটা অনুভূতি, যা আগে কখনও অনুভব করেনি। ডেভিড ওয়াজ অ্যান অ্যাকসেপ্টেড এন্টিটি। কিন্তু অনুভূতিটা পড়ে ছিল অন্য কোথাও। অন্য কোনওখানে। আজ কম্পিউটারের স্ক্রিনে সেই আবছা না-চেনা অনুভূতিটা নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। বাবা আগে ছিল একটা নাম। ক্রমশ বুঝছে বাবা না-দেখা রক্তমাংসের মানুষ। অনুভূতিটা না-শোনা লয়। একই সূত্রে বাঁধা। জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্টের স্মৃতি মনে নেই। কিন্তু ড্যডের এই অভিব্যক্তি বুকের ফাঁকা জায়গায় আলোড়ন তুলছে। মনে পড়ল, শেষবার ড্যাড যখন ইংল্যান্ড থেকে চলে এল, কান্না ভেজা গলায় বলেছিল "আই উইল মিস ইউ ড্যাড"

ড্যাডের দীর্ঘশ্বাস অনেক কথা বলে দিয়েছিল। সেদিন বোঝেনি। আজ সেই আবছায়া স্মৃতি শূন্যস্থানে তরঙ্গ তুলছে। মন্দারমণিপুরের হাল্কা ঢেউয়ের মৃদু তরঙ্গ নয়। আছড়ে পড়া উদ্দাম ঘূর্ণিঝড়।

শ্রাবস্তি পড়ে চলেছে "আই ড্যু নট নো হাউ ইউ আর ফেয়ারিং ইন ইওর একজ্যামস। আই অ্যাম নট দেয়ার টু টেক কেয়ার অফ ইওর ম্যাথস। বাট নেক্সট ইয়ার ইউ হ্যাভ টু টেক ইওর গ্র্যামার স্কুল একজ্যামস। শ্রাবস্তি, আই ক্যুড অ্যাফর্ড ইওর পাবলিক স্কুল আনটিল নেক্সট ইয়ার। ফর হুইচ আই হ্যাভ কেপ্ট মানি ইন দ্য ব্যাংক সেলিং দ্য লাস্ট বিট অফ ইনসিওরেন্স পলিসি আই হ্যাড"

শ্রাবস্তি থামল। এসব তো জানা ছিল না। মা তো কোনওদিন সেকথা তাকে বলেনি। জানতই না, বাবা তার পড়াশোনার সব বন্দোবস্ত করে রেখে এসেছে। মা কেন বলেনি? বাবাকে তার জীবন থেকে মুছে ফেলার জন্য? চোখে জল। বাবা ওয়াজ এ মিস্ট্রি টু হার। কর্তব্যহীন বাবা। পিতৃরূপ ধীরে ধীরে স্পষ্ট। মায়ের দেখানো রূপ নয়। অপরিচিত অথচ কাছের মানুষের।

আরেকটা চিঠি। তার চৌদ্দ বছর বয়েসে জন্মদিনে লেখা। ফাইলটা খুলল "আই ডোন্ট নো হাউ ইউ আর পারসিউয়িং ইওর স্টাডিস। হ্যাভ ইউ গট ইন্টু দ্য গ্র্যামার স্কুল? ডোন্ট নো। ইফ আই ওয়ার দেয়ার, আই ক্যুড হ্যাভ টেকন কেয়ার অফ ইওর স্টাডিস"

ফাইলের ডেটগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রত্যেক জন্মদিনে বাবা তাকে একটা করে চিঠি লিখেছে। চিঠি ওই তারিখের। ডেট পাল্টানো হয়নি।

সাহস সঞ্চয় করে মাকে দাবি করতে পারেনি ওয়ান্ট টু মিট মাই ড্যাড। বলেও ছিল। মায়ের মুখ-ঝামটা "হোয়াট ফর? ওয়ান হু হ্যাজ ডেসার্টেড ইউ?"

সেটাই জেনেছে, বিশ্বাস করেছে। সেই বিশ্বাসে ভর করে নিজের দুনিয়া গড়বার চেষ্টা করেছে। ক্রমশ ড্যাড মানুষ থেকে নামে রূপান্তরিত। যার পদবি আজও বহন করছে। এতদিন পর্যন্ত এইটুকুই ড্যাডের অস্তিত্ব ছিল। আজ বুঝছে, রক্ত-মাংসের মানুষটাকে। এসেছে কৈফিয়ত চাইতে। আজ সে প্রশ্নও হারিয়ে গেছে। মাতাল ঢেউটা অনুভূতির চূড়ায় ভলক্যানোর খাঁজে আঘাতে ভরিয়ে দিচ্ছে লেলিহান রোষাগ্নিকে।

আঠারো বয়সের জন্মদিনে "শ্রাবস্তি, আই অ্যাম রিয়েলি ওয়ারিড অ্যাবাউট ইউ। আর ইউ ইন দ্য রাইট পাথ? রিমেম্বার, নো ম্যাটার হুইচ পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ মে লিভ, উই হ্যাভ এ হেরিটেজ। এ রিচ ট্র্যাডিশন। ডোন্ট সোয়ে উইথ দ্য টাইড অ্যান্ড লুজ ইওরসেলফ। ডোন্ট মিক্স উইথ দ্য রং ওয়ান্স অ্যান্ড স্পয়েল ইওর লাইফ"

বাবার সাবধানবাণী।

ওয়াজ স্টিভ রং অর ব্যাড? প্রব্যাবলি সি ওয়াজ নট প্রিপেয়ার্ড ফর স্টিভ। মা শুধু তার সামাজিক পরিচয় দেখেছিল। আর্থিক প্রাচুর্য। একবারও ফিরে তাকায়নি শ্রাবস্তি মানুষটার দিকে। ডেভিডের মতো স্টিভও যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। ওপরে ওঠার সোনার চাবিকাঠি। তাই আজও ডেভিডের বিশাল প্রাসাদে লারপোসের বড়ি খেয়ে রাতের সুখনিদ্রা কিনে নিতে হয়। মানুষটা অতৃপ্তির প্রতিচ্ছবি। অতৃপ্তি সুখ দিতে পারে, শান্তি দিতে পারে না।

"হিয়ার ইউ আর" চায়ের কাপের ট্রেটা টেবলে রেখে বাবা বলল।

শ্রাবস্তির ভেতরে তখন ঘূর্ণিঝরের তাণ্ডব। চুলোয় যাক চা। চুলোয় যাক খাওয়া। বুকের কান্না বাঁধ মানছে না। উঠে আঁকড়ে ধরল বাবাকে। হাউহাউ করে কাঁদছে। বুকে চেপে ধরেছে অরিজিৎ বসুকে। মুখ লুকিয়ে বহুদিনের জমে থাকা চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে পাঞ্জাবিটা। বাঁ হাতে মেয়েকে আগলে, ডান হাতটা চুলের মধ্যে বুলিয়ে দিচ্ছে। কাঁদুক। কেঁদে নিক। অনেক বছরের জমে থাকা চোখের জলে ভাসিয়ে দিক সমস্ত সত্তাকে। অরিজিতের চোখেও জল। আঠারোটা বছর ধরে একা নিভৃতে বহন করে চলেছে। আর রুখতে পারবে না। শীতের রাতেও দু-চোখ বেয়ে নেমে এসেছে বর্ষার উপচে পড়া অশ্রু-প্লাবন।

ওরা জানে না চা কখন ঠান্ডা হয়ে গেছে। খরাতপ্ত হৃদয় চার-চোখের অশ্রুধারার প্লাবনে শান্তির মেঘমল্লার গাইছে।

মেয়ের মাথায় হাত রেখে বলল "গড ব্লেস ইউ মাই চায়েল্ড"

*****

চলন্ত ট্রেনের জানলার বাইরে, সুজলা সুফলা সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে, শ্রাবস্তি বলল "হোয়ার আর উই গোয়িং?"

হাওয়ায় প্রশ্ন। অরিজিৎ কিংবা মঞ্জরী যে কেউ উত্তর দিতে পারে। কথাটা লুফে নিয়ে অরিজিৎ বলল "প্রশ্ন করেছিলে তুমি কে? কী তোমার আইডেন্টিটি? তোমায় বলেছিলাম, বলব না দেখাব। টুক ইউ টু লোয়েস্ট পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া, দ্য বিবেকানন্দ রকস। মাদার ইন্ডিয়াকে দেখিয়েছিলাম। মনে আছে?"

জানলার বাইরে থেকে চোখ ফেরাল শ্রাবস্তি। ফার্স্ট ক্লাস এসি কম্পার্টমেন্টের নরম গদিতে বসে ভারতকে দেখছে। ট্রেনের মৃদু কম্পনের ছন্দে, মনের আনন্দে। বহুবছর আগের ঝাপসা স্মৃতিগুলো ফিরে আসছে। ড্যাড, মাম অ্যান্ড সি। মাঝে কত বছর। জীবনের রং কত বদলে গেছে। ইংল্যান্ডের কান্ট্রিসাইড থেকে বাংলার সবুজ মাটি - কত দূর। কিংবা নয়। একসঙ্গে পথ চলাই, হারিয়ে যাওয়া ছন্দ আঁকছে মনে। হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন। স্থান-কাল-মানুষ পালটালেও মনে আরেক ছন্দ।

"ইয়েস"

"নাউ উই আর গোয়িং টু সি দ্য রিচ হেরিটেজ অফ মাদার ইন্ডিয়া। বেনারস, দ্য সারপ্রাইজিং মডেল অফ হিন্দু কালচার। সারনাথ, দ্য প্লেস হোয়ার বুদ্ধিজম টুক ইটস বার্থ"

"হাউ ফার আর দ্য টু?"

"বেশি দূর নয়। এ ডিসট্যান্স অফ টেন কিলোমিটারস। পাশাপাশি দু'জায়গায় দুই ধর্মকে দেখতে পারবে। হ্যাভ ইউ হার্ড অফ গৌতম বুদ্ধ?"

"ইয়েস, অফ কোর্স। হি ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ বুদ্ধিজম"

"বুদ্ধিজমের জন্মদাতা গৌতম বুদ্ধ। মা মায়া ওনার জন্মাবার সাত দিনের মধ্যে মারা জান। হিস স্টেপমাদার মহাপ্রজাপতি ওয়াজ গিভেন টু লুক আফটার হিম। কিন্তু রিয়েলিটিতে তার পিসি গৌতমীর কাছে মানুষ। আমরা সবাই এক-একজন মুনি-ঋষির ডিসেনড্যান্ট। আমরা বসু-রা গৌতম মুনির বংশধর। গৌতম গোত্র"

"গোত্র?" শ্রাবস্তি বুঝতে পারছে না।

"ইয়েস। ভারতীয় কালচারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পূর্বপুরুষকে স্মরণ করি। আমাদের বসুদের ক্ষেত্রে গৌতম মুনিকে"

"দ্যাট মিনস আওয়ার ফোর ফাদার আর দ্য সেম?"

"প্রেসাইসলি। গৌতম মুনি"

অস্তিত্বের ইতিহাসকে কাছ থেকে দেখে চাঞ্চল্য অনুভব করছে। অরিজিৎ ছোটবেলার গল্প বলার দিনে ফিরে গেছে "ইন প্রব্যবলি ৫৬৩ বিসি বিটুইন ইস্ট নেপাল অ্যান্ড নর্থ বিহার, নদীর পারে কপিলাবস্তু বলে শাক্য ট্রাইবদের ছোট্ট রাজত্ব ছিল। রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন। নদীর ওপারে কোল ট্রাইব থাকত। ওদের রাজধানী ছিল দেবদহ। দুই ট্রাইবরা সব সময় ঝগড়া করত"

মঞ্জরী অবাক। এত জানল কোত্থেকে? ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বহুবছর ইংল্যান্ডে থাকা অরিজিৎ বসুকে দেখছে অন্য রূপে। আগে দেখেনি। জানে ওর বই পড়ার শখ। এত তত্ত্ব জানা সেটা অজানা। শ্রাবস্তি ফিরে গেছে ছোটবেলায়। মাম ঘুমিয়ে। বিনিদ্র ড্যাড ফেবল শোনাচ্ছে। এ ফেবল নয়। না-দেখা ভারতের অঙ্গ। শাশ্বত ইতিহাস।

"দুই ট্রাইবের রোজকার ঝগড়া বন্ধ করতে শাক্য ট্রাইবের রাজা শুদ্ধোদন, কোল ট্রাইবের রাজা অঞ্জনের দু-মেয়েকে বিয়ে করে। একজন মায়া, অন্যজন মহাপ্রজাপতি। গৌতম বুদ্ধ ওয়াজ বর্ন আউট অফ দ্যাট ওয়েডলক টু মায়া। গৌতম বুদ্ধের জন্ম কপিলাবস্তু দেবদহের মাঝে, লুম্বিনি পার্কে। আনফরচুনেটলি হিজ মাদার মায়া ডায়েড এ উইক আফটার হিস বার্থ"

শ্রাবস্তি বলল "দ্যাট মিনস বুদ্ধ হ্যাড টু মাদার্স। এ রিয়েল ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান হু ব্রট হিম আপ?"

মাতৃত্বের সংজ্ঞা হাতড়ে বেড়াচ্ছে। রঞ্জিতাও মাম। মঞ্জরীও। টু আর পোলস অ্যাপার্ট ফ্রম ডিফারেন্ট পারস্পেকটিভ। মাতৃত্ব নবরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। গভীর গোপন অন্ধকারে, আলোর স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে তার নিশানা। নিজের দীপালোকে পথ চলার সুর। পরের শেখানো ভুয়ো বুলির আড়ম্বরে নয়। রঞ্জিতা এতদিন ধরে যা শিখিয়েছে, তার বাইরেও পৃথিবী আছে। না-দেখা, না-ছোঁয়া মনের পৃথিবী। সেখানে আরেক মুখ ভেসে উঠছে। সে আর কেউ নয়। পাশের সর্বহারা মা, মঞ্জরী। গৌতম বুদ্ধের জীবনের মধ্যে নিজের চাওয়ার বাতাবরণ খুঁজে পাচ্ছে।

জানলার বাইরে সবুজ ঘাসের বিছানায় ক্রমে সরে যাওয়া দেবদারু গাছগুলোর দিকে চেয়ে। দৃশ্যটা পালটালেও ট্রেনে বসা মঞ্জরী আর অরিজিতের ছবি পাল্টাচ্ছে না। নন পার্মানেন্ট থিংস কাম অ্যান্ড গো। পার্মানেন্ট থিংস স্টে ফরএভার।

শ্রাবস্তির মনের কথা বুঝে অরিজিৎ বলল "ডু ইউ নো হোয়ার ইওর নেম কেম ফ্রম?"

চুপ মঞ্জরী, বলার সূত্র পেয়ে বলল "বনলতা সেন থেকে"

"সে তো জীবনানন্দ দাশের কবিতা"

থমকাল মঞ্জরী। আবার কোত্থেকে? নিজের মনেই আওরালঃ

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা

মুখ তার শ্রাবস্তির কারুকার্য

"ট্রু। গৌতম বুদ্ধ ওখান থেকেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন"

মঞ্জরী অবাক "কোথায়? জানতাম না তো"

"বুদ্ধদেব হাজার পদ্মের পাপড়িতে বসে অলৌকিক পাওয়ার দেখায় সেখানকার রাজা প্রসেনজিৎকে"

শ্রাবস্তির ভেতরে চাঞ্চল্য। বুদ্ধদেব শুধু তার গোত্রীয় নয়। তার নামের সঙ্গেও জড়িয়ে। ছোটবেলায় অনেকেই প্রশ্ন করত "হোয়ার হ্যাজ ইওর নেম অরিজিনেটেড ফ্রম?"

বোকার মতো মাথা নাড়ত "ডোন্ট নো। পেরেন্টস গেভ মি দ্য নেম"

"সো ডিফিকাল্ট টু প্রোনাউন্স"

"ইটজ অ্যান ইন্ডিয়ান নেম। মাস্ট হ্যাভ সাম স্যান্সক্রিট অরিজিন" না জেনে ওদের থামাতে কথাটা ছুড়ে দিয়েছিল।

নিজের নামের সঙ্গে এক প্রাচীন ইতিহাসের যোগসূত্র দেখে কৌতূহল বেড়ে গেল "ড্যাড, আই ওয়ান্ট টু গো দেয়ার"

"দেয়ার ইজন্ট মাচ টু সি" অরিজিৎ ইতস্তত করছিল।

জেদ করেই বলল "ইউ প্রমিসড ইউ আর নট গোয়িং টু টেল মি, বাট সো মি মাই আইডেন্টিটি"

মেয়ে বাপের মতোই। যুক্তির ব্রিফে কিছু কম নয়।

"আগে তোমায় সারনাথে নিয়ে যাব ভাবছিলাম" অরিজিৎ বুঝল এবার উল্টোদিকে ছুটতে হবে।

"ওয়ান্ট টু গো টু শ্রাবস্তি ফার্স্ট" মেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সন্ধেবেলা বেনারস পৌঁছে, হোটেলে দুটো ঘর বুক করে বলল "নট টুডে। টুমরো"

নিজেই জানে না কী করে যাবে "তোমরা এক ঘরে থাকতে পারবে তো?"

শ্রাবস্তি বাংলায় বলল "হ্যাঁ, মায়ের সঙ্গে থাকব"

চমকে উঠল অরিজিৎ। কী বলছে শ্রাবস্তি। মা!

মঞ্জরী শ্রাবস্তির ব্যাগ তুলে বলল "হ্যাঁ, আমরা মা-মেয়ে এক ঘরেই থাকব। তুমি জানো শ্রাবস্তি কী করে যেতে হয়?"

“না। খোঁজ নিয়ে দেখি”

ওদের ঘরে পাঠিয়ে খোঁজ নিতে বেরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝল, অত সহজ নয়। বইয়ে পড়া অন্য। বাস্তবে পৌঁছনো আরেক ব্যাপার।

অনেক ঘুরে, খোঁজ-খবর নিয়ে, ডিনারে বলল “শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছি। ট্রেনে করে গোরখপুরে যেতে হবে”

“ইজ দ্যাট টু ফার?” শ্রাবস্তি বাবার দিকে তাকিয়ে।

“নট টু নিয়ার অ্যাজ ওয়েল। রাফলি ২৩১ কিলোমিটার। সেখান থেকে আরেকটা ট্রেন ধরতে হবে। গোনডা রেলওয়ে রুটে। পৌঁছতে হবে গায়েনঝাওয়া বা বলরামপুর। সেখান থেকে গাড়ি। ওনলি ২৯ কিলোমিটারস”

রাতে খাটে একা শুয়ে ঘুম আসছে না। হোটেলে সহজে ঘুম আসতে চায় না। রুম সার্ভিসকে ডবল স্কচের অর্ডার দিল। ও ঘরে মঞ্জরী-শ্রাবস্তি কী ঘুমিয়ে? মঞ্জরীকে বন্ধু হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছিল শ্রাবস্তির কাছে। আজকে লবিতে ওদের কথায় মনে হল, ওর অগোচরে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জানেও না, মঞ্জরী কীভাবে শ্রাবস্তির মনে জায়গা করে নিয়েছে। এত বছর ধরেও অরিজিৎ রক্তের সম্পর্ককে পার্থিব রূপ দিতে পারেনি। মঞ্জরী কী করে সম্পর্কহীন অস্তিত্বকে আত্মীয়তায় বেঁধে ফেলল, বুঝতে পারছে না। স্কচে চুমুক দিল। মেয়েরাই পারে, যা ছেলেরা পারে না।

এতদিন বিশ্বাস করত নাসৎ উৎপদ্যতে, ন সৎ বিনশ্চয়তে। যা অসৎ (নন পারমানেন্ট) তার উৎপত্তি হয় না আর যা সৎ (পারমানেন্ট) তার বিনাশ হয় না। সেই বিশ্বাসে এত বছর মেয়ের আসার অপেক্ষায় বসে। সম্ভাবনা নেই জেনেও, অসম্ভবকে বুকে আঁকড়ে এগিয়ে যাওয়ার বৈচিত্র্যহীন ছন্দকে নতুন তুলির ক্ষীণ টানে আঁকার চেষ্টা করছিল। সেদিন বনবিতানে মঞ্জরী যখন শীতের মধ্যে বসন্তের কোকিলের ডাক শুনতে পেল ‘সে আসবে’, মন বিশ্বাস করেনি।

সে এল। তার অগোচরে মঞ্জরী ওকে সম্পর্কহীন গভীর সম্পর্কের মায়াজালে বেঁধে নিজেকে মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠা করল। আজ মঞ্জরী তার এতদিনের বিশ্বাসে নাড়া দিয়েছে। নন-পারমানেন্ট সম্পর্ক কোনওক্রমে আজ পারমানেন্ট হয়ে গেছে। অদেখা অনুভূতি নতুন বন্ধনের বাহুডোরে। নতুন আবরণে। নতুন রূপে নতুন আজানের স্বরে। বুঝতে গিয়ে সব গুলিয়ে যাচ্ছে অরিজিতের।

সব হারানো মা-ই জগজ্জননী হতে পারে। জন্মদাত্রী না হয়েও, মেয়ের মনের জননী। চেনা-জানা পরিচয়ের মায়াজালের বেষ্টনি ছেড়ে বেরিয়ে পরিচয়হীন অনুভূতির সুরে বাঁধতে। সেই পরিচয়, হারানো মেয়েকে নতুনরূপে ফেরাবে, তার হারানো পৃথিবী।

দেখা হবে অ-দেখাকে।

চেনা হবে অ-চেনাকে।

পাওয়া হবে না-পাওয়াকে।

****

এই শ্রাবস্তি! তার নামের উৎস। কোনও সংস্কৃত শ্লোক নয়। একটা জায়গা। জীবনানন্দর কবিতার বাস্তব স্মারক।

শ্রাবস্তি যখন ইলিং হাসপাতালে জন্মেছিল, প্রথাগত নাম ছেড়ে অরিজিৎ ভারতীয় নাম খুঁজছিল। ওদেশের নিয়ম অনুসারে ছ'মাসের অন্নপ্রাশন পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। এক মাসের মধ্যে বার্থ সার্টিফিকেটে নামকরণ করতে হবে। শ্রাবস্তির কথা জানত না। কলেজ জীবনে প্রিয় জীবনানন্দ দাশের কবিতার বনলতা সেনকে সারা জীবন খুঁজে বেড়াচ্ছে। বনলতা তো মেয়ে হতে পারে না। তার জীবনের স্বপ্ন। মেয়েকে বেঁধে ফেলতে চাইছিল স্বপ্নের সঙ্গে। অতএব শ্রাবস্তি।

জীবনানন্দ কী দর্শনের চোখ দিয়ে দেখেছিল বনলতাকে? বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি থেকেই কী সেই বনলতার কল্পনা?

হাজার বছর ধরে

আমি পথ হাটিতেছি পৃথিবীর পথে

সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে

মালয় সাগরে

অনেক ঘুরেছি আমি

বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে...

সেদিন বোঝেনি। নামের মাধুর্যই আকৃষ্ট করেছিল। শ্রাবস্তির কারুকার্য নিশ্চয়ই সুন্দর। ফুটফুটে মেয়েটাও সুন্দর। তাই আদর করে নাম দিয়েছিল শ্রাবস্তি।

হাজার বছর... সিংহল... বিম্বিস্বার...

সবই বৌদ্ধধর্মের প্রেরণা। সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করার পর মগধে ভিক্ষাবৃত্তি করেন। সেখানকার প্রবল-প্রতাপ নরপতি মগধরাজ বিম্বিসার। তার দর্শনে মুগ্ধ হয়ে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন। মহারাজ অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পর বৌদ্ধধর্ম প্রচার শুরু করেন। বোধগয়ার গাছের তলায়, গৌতম বুদ্ধের মূর্ছনার পর বোধিসত্ত্ব লাভ। কলিঙ্গ থেকে আসা দুই ব্যবসায়ী মূর্ছনার পর তাকে খেতে দেয়। তাঁরাই বুদ্ধদেবের প্রথম শিষ্য। পালিভাষী এই দুই বণিক তাঁর দর্শন নিয়ে যান দক্ষিণে। হীনইয়ান তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ সিংহলে। অথচ এখানে শুধু একটা গাছ আর মন্দির।

অরিজিৎ শ্রাবস্তির দিকে তাকাল। জিনস-টপস ছেড়ে সাদার ওপর খয়রি কাজের সালোয়ার-কামিজ পরেছে। হোটেলের লবিতে সকালে দেখে চমকে উঠেছিল। কোত্থেকে পেল?

“লাভলি। হোয়ার ডিড ইউ গেট দিস ফ্রম?”

পাশে সাদা কটকি ঠিক করে মঞ্জরী বলল “আমি কিনে দিয়েছি। ওর সঙ্গে আর ইংরেজিতে কথা বলবে না। একদম না, বলে রাখছি”

শ্রাবস্তি আধো বাংলায় বলল “মা ফুচকা, পুলিপিঠেও খাইয়েছে”

এর মধ্যে ওনার দেশি রসনাচর্চাও হয়ে গেছে। বাঙালি নারীর খাওয়ানোর মধ্যেই পরিতৃপ্তি।

গাইড বলে চলেছে “ইয়ে আনন্দ বোধিবৃক্ষ। বুদ্ধদেবকা পাঁচ শিষ্য মে এক কা নাম আনন্দ। ওহি ইয়ে পেড় পহলে পোঁতা থা”

জনগণ সহজে পায় না। ইয়ে বাঙ্গালি সাহাবলোগ ইধর আয়ে। জ্যাদা বকশিস মিলেগা। আবেগে বলে চলেছে “উস জমানে মে ইয়ে কোশলরাজ কা দেশ থা। নাম থা মহেত। ঔর ওহ নদী জো আপ দেখ রহে হ্যায় উসকা নাম অচিরাবতী”

মঞ্জরী গাছের পাশ দিয়ে মন্দিরের দিকে তাকাল। গাইডকে পেছনে ফেলে কটকির আঁচল ঠিক করে এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে। পেছনে শ্রাবস্তিও। দেখছে মন্দিরের স্তূপের বৌদ্ধ আমলের কারুকার্য। তার নামের উৎসভূমি। পাশে প্রবহমান উচ্ছ্বাসহীন নদী। নিরুচ্ছ্বাসের মধ্যে ছন্দ তুলে অবচেতনে তরঙ্গের লহর তুলছে। আদি সভ্যতা নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে, নতুন সম্পর্কের বাতাবরণে।

দুই দেশ মিলেমিশে একাকার যুগ্ম অনুভূতি তরঙ্গের নিরুচ্ছ্বাস প্লাবনে। বরণডালা সাজিয়ে নতুন জোয়ারে ভাসার। আভরণহীন আবরণে সাজার, নতুনের নিমন্ত্রণে।

অরিজিৎ ও গাইড পেছন পেছন। গাইড প্রবল উদ্যমে বলে চলেছে “বুদ্ধা কা আট দর্শনকে জগা মে ইয়ে এক। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগোয়ান পর বিশোয়াস নেহি করতে থে। গৌতম বুদ্ধ হাজারো পদ্মকে উপর বৈঠ কর কোশলরাজকো উসকা দর্শন শুনায়ে। কোশলরাজ খুশ হো কর, উসে ইধর রহনে দিয়ে। চৌবিস সাল ও ইঁহা থে। ইঁহা সেহি ধরম শুরু হুয়া। কোঠেওয়ালি আম্রপালী উসকে পহেলা মহিলা শিষ হুয়া। ফির

কৌস্মবী, বেরঞ্জা, সাকাশ্য। ঔর গৌতমী। জিনে উসকো বড়া কিয়া। উসে তিনবার ইহা ঘুসনে নেহি দিয়া ঈশ্বর”

ঈশ্বর হয়ে গেল গৌতম বুদ্ধ। যিনি ঈশ্বরধর্মে কখনও বিশ্বাস করেননি। বিশ্বাস করেছেন মানবধর্মে!

অরিজিৎ বলল “কত সহজে এরা মানুষকে ভগবান করে দেয়। গতের বাইরে যে সব মানুষের কথা চিরস্থায়ী, তারাই এদের কাছে ভগবান। ভগবানের সংজ্ঞাটা এরা জানে না। তাহলে তো বলতে হয় রামকৃষ্ণও ভগবান। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও”

নিজের আনন্দে গাইড বলে চলেছে “ইধর দস্যুও ভি ভগোয়ানকে ভক্ত হো গয়ে। মাহাকচ্চায়ন, মহাকাশ্যপ ছোড় কর দস্যু অঙ্গলিমাল ভি উসকা শীষ হুয়া। তীর্থঙ্কর মহাবীর ভি ইধর বহতবার আ চুকে”

ঠিক বলছে তো? অরিজিৎ অতদূর জানে না। মনে হল ঠিকই বলছে। শ্রাবস্তি হিন্দি বুঝলেও, অতটা পারদর্শী নয়। কিছু বুঝতে পারছে। ওর কাছে বেশি রোমঞ্চকর জায়গাটার নাম। শ্রাবস্তি!

অরিজিতের দিকে এগিয়ে বলল “হোয়াট সিগনিফিক্যানস হ্যাজ দিস প্লেস হ্যাভ উইথ মাই নেম?”

স্তূপের পাথরে বসে সামনের অচিরাবতী নদীর দিকে তাকিয়ে অরিজিৎ বলল “জানি না। তোমার যখন নাম রাখি, তার পেছনে আমার বহুদিনের স্বপ্ন জড়িয়ে। সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন কবিতা। এখন মনে হচ্ছে হয়ত সিগনিফিক্যানস আছে। দ্য আল্টিমেট অ্যাবোড অফ পিস। জীবনানন্দ নিশ্চয়ই অত কিছু ভেবে লেখেননি। হয়ত সাবকন্সাসে ওটাই খুঁজছিলেন”

অরিজিৎ কথা রেখেছে। মেয়ের সঙ্গে আর ইংরেজিতে কথা বলছে না।

“কী?” শ্রাবস্তির চোখে কৌতূহল।

“তোমার বোঝার ব্যাপার। গৌতম বুদ্ধ সেই সময় অর্থডক্স হিন্দুইজমটাকে মেনে নিতে পারেননি। আবার ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে উঞ্ছবৃত্তিকে জীবনের ধর্ম বলে বরণ করতে পারেননি। তাই একটা মিডল পাথ বেছে নিয়েছিলেন। দ্য করেক্ট ওয়ে অফ লিভিং। অ্যারিস্টটল, ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ অ্যারিস্টটল, হেভেন্ট ইউ?”

“ইয়েস, দ্য গ্রিক ফিলসফার” মাথা নাড়ল শ্রাবস্তি।

“অ্যারিস্টটল এক-সময় বলেছিলেন ভারচু লায়েস ইন দ্য গোল্ডেন মিন”

“সো বোথ অফ দেম ওয়ার ফলোয়িং দ্য সেম ফিলসফি। বোথ ইস্ট অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট”

অরিজিৎ জবাব দিল না। শ্রাবস্তি বুঝে নিক নিজের মতো করে। ছোটবেলায় বাবাও তাকে হাত ধরে সব কিছু শিখিয়ে দেয়নি। জীবনসমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে, প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায়। সেও তার মেয়েকে হাত ধরে চলতে শেখাবে না। নিজের মতো করে বোঝাবে না। কাউকে দর্শন শেখানো যায় না। নিজে উপলবদ্ধি করতে হয়। মঞ্জরীও তো অমিত-টুম্পাকে হারাবার পর চলার নিশানা পেল। তার নিজের দর্শন।

গাইড অরিজিতের পাশে “উস তরফ জো শহর দেখ রহে উসকে নাম থা সাহেত। ও ভি কোশলরাজকে এক শহর। ইয়ে শ্রাবস্তিকে দুসরা শহর। মেমসাব ঔর একঠো দেখনে কে জগা হ্যায়”

গাইডের দিকে ফিরে বলল “কেয়া?”

“জেটবান বিহার। ইধর সে ৫০০ মিটার” আঙুল তুলে জেটবান বিহারের দিকে।

“কত এনসেন্ট সিভিলাইজেশন। তাই না?”

“তুমি না এলে দেখাই হত না” মঞ্জরী শ্রাবস্তিকে বলল।

“আমারও” অরিজিৎ সায় দিল।

এই দেখা কী শুধু দেশ দেখা? না কি, তার না-চেনা অতীতকে নতুন রূপে পাওয়া? দেখার থেকে পাওয়াই বড়। সময়ের ক্যানভাসে এই দেখা একদিন ম্লান হয়ে যাবে। পাওয়াটা কিন্তু হারিয়ে যাবে না। চিরকাল নর্থ স্টারের মতো জ্বলজ্বল করবে নতুনের আনন্দে। অনেক ঝিনুকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া আসল মুক্ত।

****

“আপনারা বেনারস যাচ্ছেন?” স্পষ্ট বাংলায় উল্টো সোফার প্রৌঢ়ার প্রশ্ন।

ট্রেনের মৃদুমন্দ ঝাঁকানিতে আকাশি শাড়ির পাড়টা ঠিক করে মঞ্জরী বলল “হ্যাঁ। বেনারস থেকে সারনাথেও যাব”

চেষ্টা করেও তৎকালে গোরখপুর থেকে বেনারসের ফার্স্ট ক্লাসের বুকিং পাওয়া গেল না। অগত্যা টু টায়ার এসি। প্রৌঢ়ার দিকে তাকাল। সাদার ওপর সোনালি কাজ ঢাকাই শাড়ি। মনে হয় ষাটোর্ধ্ব। এক সময় সুন্দরী ছিলেন। বয়সে চামড়ার জৌলুস কমলেও সৌন্দর্যের ছোঁয়া।

প্রৌঢ়া মঞ্জরীকে বলল “আমি শ্বেতা চৌধুরী। প্রতি বছর বেনারস যাই। উনিও আমার সঙ্গে যেতেন। দু-বছর হল দেহ রেখেছেন। ইনকাম-ট্যাক্স কমিশনর ছিলেন। গোরখপুরে থাকি। হেড-মিস্ট্রেস। রিটায়ার করেছি”

উত্তরে মিষ্টি হেসে বলল “মঞ্জরী। ও অরিজিৎ” শ্রাবস্তিকে জড়িয়ে “আমার মেয়ে শ্রাবস্তি”

সুখী পরিবার, আনন্দে ঘুরছে। উনি চলে যাওয়ার পর, বাড়িটা ফাঁকা। সব থেকেও কিছু নেই। একদিন উনি ছিলেন, মেয়ে ছিল। আজ দোতলা বাড়িটা লৌহকপাট। দৈনন্দিন প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে একাই বেড়িয়ে পড়া। উন্মুক্ত আকাশে। কখনও বেনারস। কখনও কেদার-বদরি। এইটুকুই পাওয়া।

শ্বেতা চৌধুরী বলল “মেয়ে-জামাই-নাতনি নিউইয়র্ক হোয়াইটহেভেনে সেটেল্ড। এক-ই মেয়ে। বছর-দু’বছরে আসে। ওরা বলে ওখানে গিয়ে থাকতে। ভালো লাগে না”

“কেন?” মঞ্জরী জিজ্ঞেস করল।

“সারাজীবন গোরখপুরে কাটিয়ে দিলাম। ওখানে হাঁপিয়ে উঠি। অত মেকানিক্যাল লাইফ ভালো লাগে না। ঘরে বসে টিভি। উইকএন্ডে ওদের সঙ্গে বেরনো”

কথাটা শুনে শ্রাবস্তির বুক মুচড়ে উঠল। বুঝতে পারছে, কত কষ্ট বুকে নিয়ে বাবা একা কাটিয়েছে। তবুও, বাবার কাজ আছে। যেদিন থাকবে না? বাবার কষ্টের কথা মনে হতেই চোখে জল এসে গেল। শ্রাবস্তির বয়সি ব্রিটিশরা বুঝবে না বার্ধক্য কী? ইনডিপেনডেন্স ইজ মোর ইম্পরট্যান্ট দ্যান দ্য বন্ডেজ। এখন বুঝছে, ওদেশের বুড়িরা ডাক্তার দেখাতে এলে কেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে। কত জনের সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে। মেডিক্যাল হিস্ট্রির সময় থামিয়ে দিলে দুঃখ পেত। বোঝেনি, কথা বলার লোক না থাকাটাও বেদনাদায়ক। এখন বুঝছে। সঙ্গে মঞ্জরী আর বাবার সম্পর্ক। গ্লাড মঞ্জরী ইস দেয়ার। শ্রাবস্তি ছাড়া আর কী ছিল বাবার জীবনে? মঞ্জরীরও স্বামী-মেয়ে হারিয়ে? তবুও বাবা তাকে ভোলেনি। জন্মদিনের চিঠি, কালীঘাটে পুজো... নিজেকে দোষী মনে হল। উইকএন্ডে যদি বাবার সঙ্গে অন্তত একবার কথা বলত, মনটা ভরে যেত।

শ্রাবস্তির দিকে ইঙ্গিত করে মঞ্জরী শ্বেতা চৌধুরীকে বলল “ও ডাক্তার। ইংল্যান্ডে থাকে। কিছুদিনের জন্য এসেছে”

শ্বেতা চৌধুরী ধরেই নিয়েছে, ওরা পরিবার। শ্রাবস্তি বুঝলেও বাধা দিল না। ভালোই লাগছে। এরকম পরিবার সে বহুদিন পায়নি। ভাবলে ক্ষতি কী? এও শুনেছে, ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিয়ানরা স্বামী-স্ত্রী-কন্যার বাইরে, কোনও রিলেশেনশিপ অ্যাক্সেপ্ট করে না। রিলেশনশিপের বাইরেও যে রিলেশনশিপ হয়, এতদিনে বুঝেছে। যে ডেফিনিশন দিক না কেন, একটা বন্ধন, একটা পাওয়া। মনের নিবিড় আচ্ছাদন। তার অপূর্ণতাই তাকে টেনে এনেছে ইংলিশ চ্যানেলের ওপার থেকে জন্মের উৎস সন্ধানে। বন্ধনের বাইরে বন্ধন। নাম উপলক্ষ মাত্র। অনুভূতির পূর্ণতাই আসল।

প্রৌঢ়া বলল “কী ভালো মিষ্টি মেয়ে তোমাদের” শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছল “বিদেশে থেকেও সাহেব হয়ে যায়নি। বেনারস, সারনাথ ঘুরতে আসে”

মঞ্জরীর মনে হল, শাড়ি দিয়ে চোখের জল আড়াল করল “কবে যে ঈশানীদের সুবুদ্ধি হবে। নাতনিকে পুরো অ্যামেরিকান করে দিয়েছে। বাংলায় কথা বলতে পারে না। শুধু কর্তব্যের খাতিরে ইন্ডিয়া আসে। সারাজীবন গোরখপুরে বড় হয়েছে। এখন গোরখপুর ভালো লাগে না। বেনারস তো স্বপ্ন। সব কালচার অ্যামেরিকায় থেমেছে। যে গোরখপুরে বড় হলি, বিয়ের আগে পর্যন্ত কাটালি, তা সেকেলে। বাবা এই ইন্ডিয়াতেই সম্মানের সঙ্গে গর্ভনমেন্টে কাজ করেছে। সেটা কিছু নয়? অ্যামেরিকায় সুইমিং পুল সমেত বাড়ি, মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি, এই তোদের পৃথিবী?”

শ্রাবস্তি দু’দেশের, দুই সভ্যতার সমন্বয়, মেলবন্ধন খুঁজতে এসেছে। দুই পৃথিবীকে চিরকাল আলাদা করে দেখেছে দুই সভ্যতা। বিশ্বায়নে অপসংস্কৃতি মিলে জগা-খিচুড়ি পাকাচ্ছে। বাবার দেখানো ভারত, এই বিশ্বায়িত দুনিয়া থেকে কত আলাদা।

অরিজিৎ এতক্ষণ চুপ ছিল। এবার হাওয়ায় কথা ছুড়ে দিল “যার যেখানে শান্তি”

অনেক না-বলা কথা বলে দেয়। অনেক ভেদাভেদের প্রাচীরে নতুন আলো ছড়ায়। অনেক স্তব্ধ মৌনতা অনন্ত সুখ-সাগরে মেশে। সেখানেই নিভৃত মনের দিয়া। তুষারাবৃত অখণ্ডতার মধ্যে আত্মার ডাক, চিরনবীনের বেশে, চিরনুতনের ডাকে, আগামীর সোনাঝরা দিনের স্বপ্নে। স্থান, কাল, সময়ের বাইরে অ্যারিস্টটল, বুদ্ধের পথেও তো বাঁচা যায়। মধ্যপথ তো সেই এক।

শ্বেতা চৌধুরীকে বলল “দূর কী শুধু জায়গায়? দূরত্ব তো মনেও”

চমকে উঠল শ্বেতা চৌধুরী “ঠিক বলেছ। একা থাকতে নানা উল্টোপাল্টা চিন্তা ঘুরপাক খায়” অরিজিৎকে বলল “আপনাদের মেয়ে এই বুড়ো বয়সে নতুন জীবন-দর্শন শেখাল”

মঞ্জরীও আশ্চর্য। অরিজিতের মেয়ে বলবে না তো কার মেয়ে বলবে? পরিপূর্ণতা নিয়েই বলল “তাই ওকে ভারতের নানা পীঠস্থান ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। দেখানো আমাদের কর্তব্য। বোঝাটা ওর নিজস্ব”

অরিজিতের ভালো লাগছে। শ্রাবস্তিকে ভারতবর্ষ দেখাতে চেয়েছিল। শ্রাবস্তি এই বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছে শাশ্বত সত্য। পরিধির বাইরে, মঞ্জরীর মাতৃত্বের মমতায়, খুঁজে পাচ্ছে বাঁচার স্পর্শ।

শ্বেতা চৌধুরী বা রঞ্জিতা, বারবার ফিরে যাবে, না-পাওয়ার অতৃপ্তিতে। তা ছেড়েই একদিন অশ্বমেধ ছুটিয়ে ছিল। এখন ঘরে ফেরা নয়, এগিয়ে যাওয়া। পঁচিশ বছরে কতটুকুই বা দেখেছে? সামনে প্রশস্ত জীবন। সেখানে স্টিভ নেই, রঞ্জিতা থেকেও নেই। ডেভিড শুধু মায়ের দেওয়া নাম। একদিন ফিরে যেতে হবে ইংল্যান্ডে। সেখানে অরিজিৎও থাকবে না, মঞ্জরীও নয়। একাই খুঁজে নিতে হবে তার আগামী পথ। সে পথ কোথায় থামে, জানে না। শুধু জানে, তা এগিয়ে যাওয়ার পথ। তাকে একাই বাছতে হবে সে পথের দিশা। বন্ধনের মধ্যে মুক্তি।

অশান্তির মধ্যে শান্তি।

হারানোর মধ্যে পাওয়ার পরিতৃপ্তি। তার জীবনের ব্যাপ্তি।

****

মূল গন্ধকুটি বিহার!

মুগ্ধ তাকিয়ে শ্রাবস্তি। এটাই বিখ্যাত মূল গন্ধকুটি বিহার। হিস্ট্রি বইতে পড়েছে। পাশেই সেই বিখ্যাত বটগাছ বোধিবৃক্ষ। যার তলায় গৌতম সিদ্ধার্থ এনলাইটেনমেন্ট লাভ করেছিলেন। মঞ্জরীর দিকে তাকাতেই ওর মনের প্রশ্নটা পড়ে ফেলল।

"না, এটা সেই গাছ নয়। সেটা বোধগয়ায়। অরিজিন্যাল গাছটা মরে গেছে। ওর চারা সম্রাট অশোকের ছেলে মহেন্দ্র মেয়ে সংঘমিত্রার হাত দিয়ে সিংহল, মানে সিলোনে পাঠিয়েছিলেন শান্তির প্রতীক হিসেবে। এই গাছটা সেই সিংহলের গাছের ডাল নিয়ে এসে লাগানো। তবে বৌদ্ধরা এটাকেই অরিজিন্যাল বোধিবৃক্ষ হিসেবে মানে, ভক্তি করে"

বেনারস থেকে ভাড়া গাড়িতে ১০ কিমি। শ্রাবস্তি চেয়েছিল সারানাথে আগে আসতে। হয়ত বিমাতার দ্বারা পরিপোষণের জাতকের ধর্ম-উন্মোচনের রহস্য ভেদ করতে চাইছিল। অরিজিতের মনে হয়েছিল, সেটাই ভালো। বৌদ্ধধর্মের ব্যঞ্জনা না জানলে, হিন্দুধর্মের মহাত্ম্য বুঝবে কী করে?

বিশাল বটগাছের চারদিক জুড়ে নানান মন্দির আর স্তূপ। শ্রীলংকার ভক্তরা অনেকগুলো স্তূপ বানিয়েছেন। চারদিকে নানা দেশের ভক্তদের বানানো অনেক মনাস্ট্রি। একদিকে চিনা মন্দির। একটু দূরে বার্মিজ মনাস্ট্রি। অন্যদিকে জ্যাপানিজ। সব দেশের যোগসূত্র এই সারনাথে। আশ্রয়ের নতুন ব্যাখ্যা।

"ওই উঁচু স্ট্রাকচারটা কী?" শ্রাবস্তির কথায় ঘুরে তাকাল মঞ্জরী।

উত্তরের সুযোগ না দিয়ে মঞ্জরীর পাশে দাঁড়িয়ে অরিজিৎ বলল "ওটা ধামেক স্তূপ। ওখানে দাঁড়িয়েই বুদ্ধদেব তাঁর পাঁচ শিষ্যকে প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন। লোকে বলে এর মধ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি মানে রেলিক আছে। বলা হয়, স্তূপটি ৫০০ বিসিতে তৈরি। উপরের অংশের ইটগুলো মৌর্যযুগের, সম্রাট অশোকের আমলের, নিয়ার অ্যাবাউট ২০০ বিসির। এখানেই বৌদ্ধধর্মের শুরু"

শ্রাবস্তি মুগ্ধ তাকিয়ে রইল, মহামানবের ধর্মস্থলে। এই ভাঙা মন্দিরগুলো দেখলে বিশ্বাসই করাই মুস্কিল, যে ২৫০০ বছর আগে এই ধর্মের জন্ম। কোনও স্তূপ ছিল না। ছায়াঘেরা অর্ধ-বনাঞ্চলে, এক মহাভিক্ষুর বাণী শুনতে গমগম করত অসংখ্য ভিক্ষু, ভক্ত, সাধারণ লোকজন।

অরিজিৎ বলে চলেছে "বিদেশ থেকেও কত লোক আসত। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং এসেছিলেন"

অরিজিতের পাণ্ডিত্যে মঞ্জরী আশ্চর্য। ওকে পুজো-আর্চা করতে দেখেনি। ধর্ম সম্বন্ধে ওর ধারণাও জানা নেই। ওর সঙ্গে সম্পর্ক ধর্ম-অধর্মের বাইরে। নীরবতার উর্বর প্রান্তে। তবুও মনে হল, অবসর সময় ধর্মের বই পড়েছে। হয়ত নিজেকে খোঁজার আশায়।

অরিজিৎ বলে যাচ্ছে, মঞ্জরী শুনছে। ইতিহাসের তারা আজ কোথায়? এই কী মানুষের জীবন? সবই টেম্পোরারি? পারমানেন্ট কিছুই নেই? তাহলে, অমিত-টুম্পার জন্য দুঃখ করে কী হবে? ওদের মতো সেও একদিন চলে যাবে। ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়ায়, স্বপ্নে বিভোর না হয়ে, যেটুকু আছে, তাকে ধরে আশ্রয় খোঁজাই ঠিক। নয় কী?

চারপাশে তাকাল। বহু মানুষ। অবাক চোখে চারদিক দেখা টুরিস্টরা। লাল কাপড়ে হাতে চাকার মতো কিছু ঘোরানো বুদ্ধিস্ট মঙ্ক। ইউনিফর্ম পরা গ্রুপে স্কুলের বাচ্চা। ক্লায়েন্ট খুঁজতে ব্যস্ত ধূর্ত গাইড। সব মিলিয়ে বিচিত্র হ-য-ব-র-ল।

স্তূপে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শ্রাবস্তি। ভেতরে আলোড়ন, নতুন জাগরণে। তার মধ্যে দুটো মুখ বারবার ভেসে উঠছ, রঞ্জিতা আর মঞ্জরী। মাতৃত্বের সংজ্ঞা খুঁজছে মন, সর্বক্ষণ। জন্মদাত্রী, না নতুন পথের যাত্রী? এসেছিল বাবার কাছে কৈফিয়ত চাইতে। বাবা দেখাচ্ছে জীবনবোধের পথ। লন্ডনের হাইড পার্কের ভিড়ে এই বোধ খুঁজে পায়নি। ফিরতে হয়েছে মাতৃভূমিতে, মাতৃত্বের নতুন ব্যাখ্যা শিখতে।

ঘুরতে ঘুরতে চোখ পড়ল এক ফ্যামিলির দিকে। বাবা, মা, দুই মেয়ে। বড় মেয়েটির বয়স তার মতোই হবে। চারজনে হাসছে, গল্প করছে, গাইডের পেছনে দৌড়চ্ছে। কমপ্লিট ইউনিট। ভেতরের খরস্রোতা উপচে পড়ল চোখের কোণে। মঞ্জরী দূর থেকে দেখছিল। মনের অবস্থা আন্দাজ করে এগিয়ে এল।

"নাথিং ইজ লস্ট। কিছুই হারায়নি। শুধু কিছু মূহূর্ত। সবার জীবনেই হয়। তার মধ্যেই বেঁচে থাকতে হয়"

"কী নিয়ে?" ফেলে আসা অতীত তাকে জীবনের দোড়গোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কোন পথে? যে পথে এতকাল হেঁটেছে? না, যে পথের বাণী এখন শুনছে? পশ্চিম না পুব, কোনটা? মঞ্জরীকে ইতস্তত দেখে, অরিজিৎ এগিয়ে শ্রাবস্তিকে বলল "আত্মদীপো বিহরথ অওসরনা অনঞ্চ সরনা"

চমকে উঠল মঞ্জরী। এ যেন অন্য নতুন অরিজিৎ। এতদিন ওর পাশে দাঁড়াবার জন্য মন কাঁদত, এখন শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠছে।

বুঝতে পারেনি শ্রাবস্তি "তার মানে?"

অরিজিৎ শ্রাবস্তির মাথায় হাত রেখে বলল "এবার থেকে তোমার, নিজের দীপালোকে পথ চলা। অন্যের ওপর নির্ভর করো না। একে বলে অষ্টমাঙ্গিক মার্গ। বুদ্ধের ভাষায় প্রজ্ঞা, শীল, সমাধি। এরপরে আর কিছুই নেই। শুধুই পূর্ণতা"

মঞ্জরী বুঝতে পারেনি "সমাধি?"

"পৌছতে পারলেই সব পাওয়া। ইউনিভার্সের সঙ্গে মিলন, একাত্মতা"

শ্রাবস্তির মাথায় ঢুকছে না। শুধু আলোড়ন তুলছে দুটি শব্দ 'আত্মদীপো ভব', নিজের দীপালোকে পথ চলা। সেই দীপকে কী করে ইংল্যান্ডের মাটিতে জ্বালিয়ে রাখবে? জীবন-দর্শন এক। জীবন-যাপন আরেক। বৌদ্ধধর্মের গূঢ় তত্ত্ব বোঝে না। তার কাছে আগামীর বাঁচার মন্ত্রই প্রধান।

অরিজিৎ বুঝতে পেরেছে মেয়ের সংশয়। জন্মের সম্পর্ক অনেক না-বলা ভাষা ছুঁয়ে যায়। মনের নিভৃত দোটানাকে...

মাথায় হাত রেখে বলল "তুমি তো এখানে থাকতে আসনি। উই হ্যাভ টু গো ব্যাক। বিফোর ইউ রিচ ইংল্যান্ড আই উইল সো ইউ দ্য ওয়ে"

এ না হলে বাবা। বাবা ইন্ডিপেন্ডেন্স কেড়ে নেয় না, লাইক সাম ওয়েস্টানার্স থিংক। ইন্ডিপেন্ডেন্সের মধ্যে নতুন পথ দেখায়। বুক ভরে গেল পরিতৃপ্তির আনন্দে। নতুন পাওয়ার ছন্দে। খুঁজতে এসেছিল জন্মদাতাকে। নিয়ে যাবে কর্মজীবনের সঙ্গীকে। নিজের পথে পা বাড়িয়ে। আগামীর বাঁচার মন্ত্র। সেখানে অরিজিৎ-মঞ্জরী না থাকলেও, তাদের খুঁজে নিতে হবে নিজের দীপালোকে। চাওয়া-পাওয়ার বাইরে চিনে নিতে হবে নিজের আলোকে। আজ নিজের মতো দুই বিচ্ছিন্ন সত্তা ধরা দিয়েছে চেতনার প্রশস্ত দিবালোকে। এইটুকুই তার পাওয়া।

****

গঙ্গা!

এই সেই বিখ্যাত কাশীর গঙ্গা। শ্রাবস্তি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে। কাশী - দ্য ওল্ডেস্ট লিভিং সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।

নৌকোটা গঙ্গায় ভাসছে। নৌকোওলা টানা বকে চলেছে কাশীর মহাত্ম্য বর্ণনায়। অসংখ্য ঘাট। মাঝি পরপর নাম বলে যাচ্ছে। মনে রাখা অসম্ভব। তার মধ্যেই চোখে পড়ার মতো দশাশ্বমেধ ঘাট। ঘাটে অসংখ্য চাটাইয়ের ছাতা। বেনারসের হোটেলে ইন্টারনেটে আগেই দেখেছিল। এই ছাতাগুলো কাশীর ট্রেডমার্ক। নীচে, সারি দিয়ে বসে আছে পণ্ডিতের দল। এখানে হিন্দুধর্মের সব ক্রিয়া কাজই চলছে। মাথা মুণ্ডন, স্নান করছে অসংখ্য মানুষ। পরপর ঘাট। প্রয়াগ ঘাট, শীতলা ঘাট, অহল্যাবাই ঘাট, দ্বারভাঙা ঘাট, রাণামহল ঘাট, চউস্থি ঘাট, রাজ ঘাট, নারদ ঘাট, কেদার ঘাট, হরিশ্চন্দ্র ঘাট, হনুমান ঘাট, আনন্দময়ী ঘাট, জানকী

ঘাট, অসি ঘাট। মাঝি মন্ত্রের মতো মুখস্ত বলে যাচ্ছে। শ্রাবস্তির মাথায় ঢুকছে না। স্লো মোশনে চলা ভিডিওর মতো। ফ্রেমগুলো থেমে এগিয়ে যাচ্ছে নতুন ফ্রেমে। এক একটা ফ্রেম, হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপ। তার মধ্যেই মিশে ধর্মের বিভিন্ন আচার।

হঠাৎ নাকে বিশ্রী পোড়া গন্ধ। তাকাতেই চোখে পড়ল, একটা ঘাটে শবদাহের দাউদাউ বহ্নিশিখা অল্প ব্যবধানে জ্বলছে। লোকের ভিড়। অনেক ডেডবডি ঘাটে শোয়ানো। কিছুলোক কান্নাকাটিও করছে। এটা নিশ্চয়ই ক্রিমেশন এরিয়া।

“এহি হ্যায় মণিকর্ণিকা। ইহা মাতা পার্বতীকা কুণ্ডল খো গয়ে থে। শিউজি হর গুজর হুয়ে আদমিকো মন্ত্র শুনাতে থে। বড়ি মাহাত্ম্য হ্যায় ইয়ে জগহ কা”

নৌকাওয়ালা কি বলছে খেয়াল নেই। চোখ উল্টদিকের মণিকর্ণিকা ঘাটে।

অরিজিৎ বলল “ওটা শ্মশান। ক্রিমেটোরিয়াম। আমাদের রিলিজনে মারা যাবার পর কবর দেওয়া হয় না। ডেডবডি পুড়িয়ে ফেলা হয়”

ক্রিমেটোরিয়ামের কথা আগে শুনেছে। কখনও দেখেনি। এই প্রথম ক্রিমেটোরিয়াম দেখা।

অরিজিৎ দোদুল্যমান নৌকোর কাঠের তক্তায় ভর দিল “এই যে আগুন জ্বলছে দেখছ, এটা ট্র্যাডিশনাল ক্রিমেশন পদ্ধতি। কলকাতার ক্রিমেটোরিয়াম অবশ্য এরকম নয়। ওখানে ইলেকট্রিক বার্নার আছে। ইট টেকস এ শর্টার টাইম। আমাদের হিন্দুধর্মে বলে, আগুন দেহকে শুদ্ধ করে। ফাইনাল স্টেজ অফ মর্টাল এক্সুমেশন তাই আগুন দিয়ে। আওর সোল ইজ পিওর। ইট ইজ দ্য স্রাউড অফ আওয়ার মর্টাল বিইং দ্যাট ইজ ইমপিওর”

মণিকর্ণিকা ঘাটের দিকে শ্রাবস্তি চেয়ে। ঘাটের লেলিহান আগুণের দিকে নয়। ভস্মশেষের দিকেও নয়। চেয়ে আছে সাত বছরের ছোট মেয়ের ডেডবডির দিকে। ফুটফুটে মেয়েটা যেন ঘুমিয়ে আছে। মনে হয় না, আর নেই। তাকে জড়িয়ে, একটি লোক আর মহিলার বুকফাটা কান্না বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে আর নেই। মেয়েটির বাবা-মা হবে। না হলে এমনভাবে কেউ কাঁদে? ওদের কান্নায় সন্তানহারা মানুষের আর্তনাদ। ওদের বুকফাটা হহাকার হাতুড়ি মারছে বুকে। অনেক মৃত্যু দেখেছে ডাক্তারি জীবনে। মৃত্যুর পরিণতির প্রতিশব্দ এমনভাবে নাড়া দিয়ে যায়নি। এ শুধু মৃত্যু নয়, বাবা-মায়ের বুকফাটা যন্ত্রণা। পেয়েও হারানোর মর্মভেদী কান্না। তীব্র ব্যথার সাক্ষাৎ অঙ্গীকার। আঘাত করছে বারবার। এ প্রত্যেক দেশের সন্তানহারা বাবা-মায়ের কান্না। সেই কান্না মিশছে অন্তরের অস্তিত্বকে হারানোর বেদনায়। মানুষ চলে যায়। কিন্তু শূন্যতা থেকে যায়।

কয়েকমাস আগেও, অরিজিতের কাছে সে ছিল বেঁচে থেকেও মৃত। অস্তিত্বের অনির্বাণ অগ্নি নয়। এমনি করেই কী বাবা একলা তার জন্য কাঁদত? নিশ্চয়ই। না হলে, অমন চোখের জলের চিঠি প্রতি জন্মদিনে কী লিখতে পারত হারানো মেয়ের জন্য? রঞ্জিতার ঘেরাটোপে যে ফেরার সম্ভাবনা নেই, অরিজিতের থেকে কে বেশি জানে? এতদিন শুধু রঞ্জিতাকে দেখেছে। অরিজিৎকে চিনেছে রঞ্জিতার আলোয়। আজ আবার নতুন করে দেখছে, তার জন্মদাতা বাবাকে। সব রাগ মিলেমিশে একাকার, না-বলা ছন্দে। তার সুর ১৮ বছর ধরে বয়ে বেড়াচ্ছে। কেন সে বোঝেনি? এতকাল ধরে, কেন শোনেনি হারানোর সুর? মায়ার পৃথিবীর দৌড়ে ভুলে গেছিল, জন্মদাতা পিতাকে। না-চেনা যোগসূত্র।

মিথ্যে বলেছে রঞ্জিতা ‘ইওর ড্যাড হ্যাজ ডেসার্টেড ইউ’

হাউ ক্যান এ ড্যাড ডেসার্ট হার ওনলি ডটার? হোয়াট এ ফুল সি হ্যাজ বিন। বাবার জন্য মায়া হচ্ছে। এসেছিল অনেক প্রশ্ন নিয়ে। বাবা কথা রেখেছে। প্রশ্নের জবাব দেয়নি। উত্তর দেখিয়েছে। না-বলা কথাকে, দেখার ভাষা বলে দেয়। না-বলা শব্দ, দেখার শেষ প্রান্তে হিল্লোল জাগায়। না-পাওয়া পৃথিবী, নতুন সুরে খেলে, না-পাওয়া ছন্দের নব-জাগরণে।

শ্রাবস্তির চোখে জল। বাবার হাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। আস্তে চাপ দিল। অন্তরে ভালোবাসার তীব্র ঝড়। বহু বছরের না-পাওয়া অনুভূতি ফিরে এসেছে। ছোটবেলার তারাটা আর হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট

ইউ আর নয়। নেমে এসেছে মর্ত্যে। অচেনা বাবাকে নতুন করে চেনায়। ফুটে উঠেছে নতুন আলোকে। সেই আলো বর্ণময় গীতি নয়। হারানো স্বপ্নের স্মৃতিও নয়। প্রবহমান জীবনের প্রকৃতি। তার বেঁচে থাকার দীপ্তি। আগামী জীবনের নতুন গতি। সেখানেই পরিতৃপ্তি।

কয়েক মুহূর্ত...

“আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?”

নিজেকে সামলাতে পারল না। দু-চোখের ধারায় অরিজিৎ অনুভব করছে মেয়ের অন্তঃস্রাবী নীরব স্বর। বুকে টেনে নিল শ্রাবস্তিকে। কোনও কথা নেই। সব কথা থেমে গেছে বাবা-মেয়ের হৃদয়ের স্পর্শে। ভাষাহীন অনুভূতির আবেগে। আশ্রয়প্রার্থী বিহঙ্গের নৈঃশব্দ্যে। নৌকাওয়ালাও ইতিহাস বলা থামিয়ে দিয়েছে। কীসের ইতিহাস? বর্তমান যেখানে নতুন ছন্দে দুটি জীবন্ত আত্মাকে বরণ করে নিয়েছে, সেখানে মৃত অষ্টগণ্ডা লোকের নাম আওড়ে কী লাভ? বহুদিন নৌকাওয়ালা-কাম গাইডের কাজ করেছে। আজ তার কাজ সার্থক। পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে কিছু কামিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু এই মুহূর্তের অনুভূতিকে টাকার পাল্লায় বিচার করা যায় না। আবেগে বলে উঠল “খুস রহো বাবু। খুস রহো বেটি। মেরা ঔর কুছ কহনেকা নেহি”

মঞ্জরীর চোখে জল। অনেকদিন আগে শীতের সকালে শুনতে পেয়েছিল কোকিলের রব। সেই রব আজ একসঙ্গে মিশে গেছে বহু চেনা রাগের না-শোনা সুরে।

মেয়েকে বুকে আগলে, ফিসফিস করে বলল “মেয়ে তো বাবার কাছে ক্ষমা চায় না। বাবার কাছে দাবি করে। তোমার দাবিই আমার সব থেকে বড় পাওয়া”

কোন অরিজিৎকে দেখছে শ্রাবস্তি? রঞ্জিতার দেখানো না রক্তমাংসের অরিজিৎ? একটাই মানুষ। দুই দৃষ্টিভঙ্গি। সময় হয়েছে নতুন আঙ্গিকে বিচারের। নিজের মতো করে। এতদিনের দেখা জীবনকে সে আবার নতুনভাবে দেখেছে। এই নতুন দেখার আলোকে, আগামীর পাথেয় তৈরি করতে হবে। ক্রমশ ডেভিডের ছবিটা মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখের জলে, রঞ্জিতার ছবিটাও ঝাপসা। স্টিভ কী এটাই চেয়েছিল ওর থেকে? না পেয়ে, দূরে সরে গেছে? অশ্রুরাশির ঝাপসা আবছায়ায় ক্রমশ ফুটে উঠছে আরও দুটি মুখ। যাদের আলোয় নতুন করে দেখতে পারছে নিজেকে। নতুন করে পাওয়া নাড়ীর বন্ধনকে...

এই বন্ধনের মধ্যেই তো মুক্তির আনন্দ। যা ঝাপসা হয়ে এসেছিল, সে পথের শেষ দেখার জন্যই অশ্বমেধ শুরু হয়েছিল না-জানা পথে। সেই ঘোড়া যখন এখানে ঠেকেছে, এটাই তার আগামীর পাথেয়, বাঁচার নতুন মন্ত্র।

চোখের জলে অরিজিতের শার্ট ভিজে গেছে। ঝাপসা চোখে চেয়ে আছে মেয়ের দিকে।

সি ইজ হিস স্কাই।

সি ইজ হিস হোপ।

মেয়ের চোখে তাকিয়ে মনে হল “আই নো, আই উইল বি লিভিং ইন দিস বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড, ইভন আফটার আই অ্যাম গন” ওর মধ্যেই তার প্রকাশ।

ওর মধ্যেই তার বিকাশ।

সে আর কেউ নয়। তার একমাত্র মেয়ে শ্রাবস্তি।

****

নীচে ভেসে বেড়ানো মেঘের ফাঁকে সোনালি রোদের হাসি পূর্ণতার প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে। অনেক বছরের না-পাওয়ার ছোঁয়া। সারাজীবন ছুটে বেড়ানো স্বপ্নের মায়াজাল কাটিয়ে, মায়ার বাইরে, পূর্ণতার স্নিগ্ধ আবেশটুকু নিয়ে বিভোরে বেঁচে থাকা। শূন্যতা সেখানে অন্ধকারে মুখ ঢেকেছে। মেঘের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সে আর অজানার পথে পাড়ি দিচ্ছে না। অজনাকে জেনেই বরণ করেছে আগামীর পাথেয়।

বাবা আর খুঁজে পাওয়া হৃদয়ের মা, দমদমে বিদায় জানাতে এসেছিল। মঞ্জরীর চোখ জলে ছলছল। কাছের মেয়েটা দূরে চলে যাবে? টুম্পা ফিরে আসেনি। মঞ্জরী জানে, শ্রাবস্তি ফিরে আসবে। কিন্তু কাছে না-থাকা মেয়ের ই-মেল, হোয়াটসঅ্যাপ ফোনে মন ভরে?

শ্রাবস্তি আশ্বাস দিয়েছে "প্রতি উইকএন্ডে ফোন করব"

পেয়েও হারাতে হচ্ছে। ফোন করা আর পাশে পাওয়া কী এক জিনিস? দুধের স্বাদ কী ঘোলে মেটে? তবুও ওটুকু আশায় বুক বাঁধা। হারানোর মধ্যে মনের প্রদীপে সন্ধ্যারতি। সব কিছুই তাই। কিছুই থাকে না। কদিন আগেও ছিল না। পেয়েও হারাতে হয়! তবুও এর মধ্যেই চলে জীবনের প্রবাহ। মৃত্যু একদিন সে প্রবাহে যবনিকা টানে। আবার জন্ম! অন্য রূপে, অন্য রঙে পাওয়া-হারানোর খেলা। আবার মৃত্যু। লাইফ সাইকেলের এই গোলকধাঁধায় পার হয়ে যায় জন্ম থেকে মৃত্যু, আজীবন। জীবনের মানে বোঝার আগেই জীবন শেষ হয়ে যায়।

অরিজিৎ চুপ করে দূরে দাঁড়িয়ে। দেখছে তার একমাত্র মেয়েকে। অনেক দিনের অদেখাকে নতুন রূপে। সেখানে কোনও সুর নেই, তাল নেই, ছন্দ নেই। শুধু আছে বহুদিনের স্বপ্নের জীবন্ত অনুভূতি। মেয়ের চোখে তাকিয়ে। তার মতোই অন্তর্ভেদী সে দৃষ্টি। চোখের মণিদুটো জ্বলজ্বল করছে।

সেই তার সূর্য।

সেই তার চন্দ্র।

সেই তার তারা।

সেই তো তার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড।

এই অখণ্ড, বিস্তৃত বিশ্বকে দেখছে, মেয়ের চোখের তারায়... তার মনে হল, এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পরেও বেঁচে থাকবে তার মেয়ের মধ্যে। সে আর কেউ নয়। তার একমাত্র মেয়ে শ্রাবস্তি।

মঞ্জরীর দিকে তাকাল। ছোটবেলায় দেখা বনলতা সেনের মায়াজাল ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বের আঙিনায়, বুঝতে পারছে, ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়া কাটিয়ে তো চলে যেতেই হবে। এই পৃথিবীর নিয়ম। স্বপ্নের বনলতা সেনের দুনিয়ায়, সে যদি আগামীর স্বপ্ন এঁকে দিতে পারে, এর চেয়ে সুখের মৃত্যু আর কী হতে পারে? সেই স্বপ্নের আত্মজ আর কেউ নয়। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া তার শ্রাবস্তি।

বাবাকে চুপ থাকতে দেখে, শ্রাবস্তি এগিয়ে এল। বাবার হাতটা তুলে চাপ দিল। অরিজিৎ কোনও কথা বলছে না। মুখটা শ্রাবস্তির কারুকার্যের মতোই আজ একটুকরো পাথর।

"আমি আবার আসব। প্রতিবছর আসব। যখনই তোমার দরকার হবে তখনই"

অরিজিৎকে চুপ দেখে, শ্রাবস্তি ওর ডান হাতটা তার মাথায় রাখল। ফিসফিস করে বলল "বাবা তুমি শুনিয়েছিলে 'তৎত্বম অসি'। বিবেকানন্দ রকসে দাঁড়িয়ে তুমিই বলেছিলে আমার দেহের অণু-পরমাণু ভারতবর্ষ। আই অ্যাম ইন্ডিয়া" জড়িয়ে ধরে অশ্রুচোখে চেয়ে বলল "একা নই। তুমি আমার সব। আমার দেহের অণু-পরমাণু তুমি। আই অ্যাম ইউ"

নিজেকে সংযত রাখতে পারল না অরিজিৎ। চোখের জলে প্রবল আবেগে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল। ভাষাহারা মৌনতা দুজনের স্পর্শে শব্দ খুঁজে নিল ছোটবেলার রাইমের মধ্যে।

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার

হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর

সেই তারারা নিঃশব্দে গেঁথেছে মালা। নতুন জীবনের ডালা। নতুন ছন্দে। পরম প্রাপ্তির আনন্দে। এ জন্মে, এর থেকে আর বেশি কী চাওয়ার থাকতে পারে?

ফিসফিস করে বলল "টেক কেয়ার মাই গার্ল"

পাশে দাঁড়ানো মঞ্জরীর চোখেও জল। শীত ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। কোকিলের ডাক বনবিতানের নীরব ঐকতানেই শুধু নয়। সে ডাক শুনতে পাচ্ছে, হাজারো কলধ্বনির মধ্যে। বসন্তকে নবরূপে আলিঙ্গনে। ফেলে

আসা অনুভূতির নতুন বরণমালায়।

“ইউ টু” শ্রাবস্তি ফিসফিস করে বলল।

অরিজিতের বেষ্টনী শিথিল হতে, শ্রাবস্তি হ্যান্ড লাগেজ তুলে মঞ্জরীর দিকে এগিয়ে গেল “আমি তো আসতেই থাকব। যখনই তোমরা চাইবে। মা, বাবার কেউ নেই। তুমি দেখো”

শ্রাবস্তিকে বুকে টেনে চোখের জলের বন্যায় ফিসফিস করে বলল “ঘর কী? আমারা হয়ত কেউ পাব না”

ওর কথার রেশ টেনে শ্রাবস্তি বলল “ইংল্যান্ডে বসে ঘর খুঁজতাম। সংসার খুজতাম। ভবিষ্যৎ খুঁজতাম। ‘আমার’ ভারতবর্ষে এসে দেখলাম ঘর শুধু দেশ-কাল-সময়ের মধ্যে নেই। ঘর তো সব-সময়ই আছে। দেখাটা বাকি ছিল। আজ সে দেখা পূর্ণ হল”

“ঠিক বলেছ। ঘর তো আমাদের মনে। তোমার আসাতে আমারও চেনা হয়ে গেল”

সিকিউরিটি এনক্লোজারের ওপাশে, শ্রাবস্তির হাত-নাড়া অবয়ব মেলাবার আগে, হারিয়ে গিয়েছিল দু’জনেই। ভাষাহীন নীরবতায়। স্তব্ধ মৌনতায়। তা যেন গতিময় বর্তমানকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অনাদি-অনন্তের সামনে।

অরিজিৎ মঞ্জরীর হাতে চাপ দিল। অরিজিতের হাতটা টান দিয়ে মঞ্জরী বলল “তবে চলো। বাকি যে কটা দিন আছে, পায়-পা মিলিয়ে হেঁটে নিই”

শ্রাবস্তির চোখের জল শুকোতে কতক্ষণ লেগেছিল, জানে না। প্লেনটা মাটি থেকে ডিভোর্স করার আগে, ভারতের সুজলা সবুজের দিকে অপলক চেয়ে। এয়ার হোস্টেস বলে চলেছে “প্লিজ ফাস্টেন ইওর সিট বেল্টস। উই আর টেকিং অফ ফ্রম দ্য নেতাজি সুভাষ ইন্টারন্যাশনল এয়ারপোর্ট। দ্য ফ্লাইট টু হিথরো ইজ গোয়িং টু টেক আস ইলেভেন আওয়ার্স। দ্য ওয়েদার অ্যাট...”

চিরাচরিত বুলিগুলো কানে আসছে না। বুকের ভেতর দোটানা। যে পৃথিবীতে বড়ো হয়ছে তার থেকে যে পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছে তা কত আলাদা। কোন পৃথিবীর পথে সে হাঁটবে? মনের পৃথিবীর সঙ্গে বাস্তবের পৃথিবীর কত তফাত।

খুঁজতে এসেছিল বাবাকে। দেখে গেল বাবাকে, ভারতের আদি অকৃত্রিম প্রাচীন ঐতিহ্যকে। সেই তো এই বিশাল দেশের অতিপ্রাচীন সভ্যতার একটুকরো মুক্ত। লন্ডনের গাওয়ার স্ট্রিটে বা হ্যাম্পটন কোর্টে কোথায় দাঁড়াবে?

আসার আগে বাবা তাকে ছোট্ট এমপিথ্রি প্লেয়ার কিনে দিয়েছিল। বলেছিল “এখন নয়। হিথরোতে নেমে ইমিগ্রেশন থেকে বেরিয়ে এটা শুনবে”

“কী আছে?” শ্রাবস্তি উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করেছিল।

“শুনলেই বুঝতে পারবে”

মন চাইছিল এখুনি শোনে। কী সুর, কথা, বাঁধা আছে? বাবা দৃঢ়ভাবে বলে দিয়েছে “কিছুতেই এর আগে শুনবে না। মাই হনেস্ট রিকোয়েস্ট টু ইউ”

বাইরের সোনালি রোদের ঝলকানির আলোয় সংশয়ের উত্তর খুঁজছিল। কেবলই মনে পড়ছে ভারতের অতিপ্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সারসত্য ‘মিডল পাথ’। বাবাও এও বলছিল, অ্যারিস্টটলের কথা ‘ভারচু লায়েস ইন দ্য গোল্ডেন মিন’। যদি দু-দেশের দুই অতিপ্রাচীন সভ্যতা একই ভাষা বলে থাকে, তফাত কোথায়? তফাত কিছুই নেই। দেখাটাই কেবল আলাদা।

যে দেখেনি, সে বোঝে না।

যে বোঝেনি, সে চেনে না।

আর যে চেনে না, সে কেমন করেই বা জানবে, যে মানব-সভ্যতার দৈনন্দিন প্রবাহের বাইরে সর্বকালে সমস্ত ধর্মই মানুষের জন্য একটাই ভাষা বলেছে। সব দেশেই তো মানুষ, আনন্দে হাসে, দুঃখে কাঁদে।

ইতিহাসের একইভাবে পুনরাবৃত্তি হয়েই চলে। তবুও অঞ্চলভেদে তাদের রীতি-নীতি আলাদা। তাকেও তো একটা রীতি মেনে সংসারের পথে চলতে হবে। সে তো অরিজিৎ বসু নয়, যে সব দেশ ঘুরে, নিজের পৃথিবীতে হারিয়ে যেতে পারবে?

প্লেন যখন হিথরোতে ল্যান্ড করল তখন দুপুর। গ্রিনউইচ মিন টাইমে দুপুর দুটো। ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকার জন্য ইমিগ্রেশন ক্লিয়ার করতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। বাইরে কনভেয়ার বেল্টে লাগেজের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল।

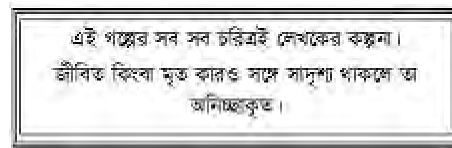
দেখল ওপাশে এক মিক্সড ক্যাপল। কোলে ছোট্ট ফুটফুটে শিশু। দ্য ম্যান অ্যান এশিয়ান, ইন্ডিয়ান কিংবা পাকিস্তানি। বউটি ব্রিটিশ। কোলের বাচ্চার দিকে তাকল। সাদা না কালো? এই নিষ্পাপ শিশুর তো কোনও রং নেই। সাদা-কালোর ওপরে উঠে, মিটমিট হাসছে। ওই ক্যাপল শিশু কোলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে। ট্রলি ঠেলতে দেখল, ওপাশের হাজারও ভিড়ে ওদের পরিবার ওদেরকে চিহ্নিত করেছে। এগিয়ে এসে দু-হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। বাচ্চার হাসি তাদের অনুভূতিকে বহির্বিশ্বে নিয়ে এসেছে। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আনন্দে এগিয়ে চলেছে লিফটের দিকে...

শ্রাবস্তি ট্রলি ঠেলে বেরিয়ে এল। বাইরে থেকে সাটল বাসটা ধরতে হবে। রামাদা-ইনের উলটো দিকে কারপার্কে ওর গাড়ি। ওখান পর্যন্ত নিয়ে যাবে ফ্রি সাটল।

বাসে বসে মনে পড়ল বাবার কথা। মঞ্জরীর কথা। কলকাতার কথা। ভারতের কথা। ফেলে আসা অচেনাকে নতুন করে দেখার কথা। আর বাবার দেওয়া এমপিথ্রি প্লেয়ারের কথা। কানে হেডফোন লাগিয়ে এমপিথ্রি প্লেয়ার চালিয়ে দিল। কথা নয়। অতি পরিচিত পুরনো হিন্দি গান। সাউথহলে রেস্টুরেন্টে কয়েকবার শুনেছে।

এমপিথ্রি প্লেয়ারে বেজে চলেছে বাবার দেওয়া গানঃ

জিনা ইয়াহা মরনা ইয়াহা
ইসকে সিওয়া জানা কাঁহা
জি চাহে যব হামকো আওয়াজ দে
হাম হ্যায় ওহি, হাম হ্যায় ইয়াহা...


এই গল্পের সব সব চরিত্রই লেখকের কল্পনা।
জীবিত কিংবা মৃত কারও সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলে তা
অনিচ্ছাকৃত।